উল্লাস মল্লিক

হাসি মজা ঠাসাঠাসি

হাসি মজা ঠাসাঠাসি
উল্লাস মল্লিক

পত্র ভারতী

উল্লাস মল্লিক

হাসি মজা ঠাসাঠাসি

পত্র ভারতী
www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১২

HASI MAJA THASATHASI
by
Ullas Mallick

ISBN 978-81-8374-170-5

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রচ্ছদ সুদীপ্ত মণ্ডল
অলংকরণ জুরান নাথ

মূল্য
১২০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail : patrabharati@gmail.com www.bookspatrabharati.com
Price ₹ 120.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

আমার স্নেহের

বুজুরানি (দেবলীনা চক্রবর্তী)-কে

যে তার মামার সঙ্গে শুধু ঝগড়াই করে

সূচিপত্র

চপের ভেতর ভূত ৯

বাকরুদ্ধ বাগ্‌বাহাদুর ১৬

চাঁদুর হাতে হ্যারিকেন ২৭

ভূত ধরলেন বিনোদবিহারী ৩৩

ভাল্লুকনাচ ৪৫

নতুন নাটকও ভণ্ডুল ৫৭

সাধনবাবুর সম্পদ ৬৮

ক্রিকেট বনাম ফুটবল ৮৫

দামু দারোগার দাওয়াই ৯৭

হেলে সর্প দোষ ১০৩

শেষে হাসল হিরু ১১৪

দারোগার চাবি ১২৬

চপের ভেতর ভূত

'চপের ভেতর ভূত'—গল্পটা লিখে নিজেরই গা ছমছম করতে লাগল সাহিত্যিক করালীচরণের।

করালীচরণ সাহসী মানুষ। রাতবিরেতে যাত্রা দেখে একা ফেরেন, অমাবস্যার রাতে নির্জন শ্মশানে যেতে বুক কাঁপে না, মাঝে মাঝে নিশুতি রাতে ডাকাতে কালীতলায় গিয়ে গল্পের প্লট ভাবেন।

কিন্তু এখানে ভূতের যে বর্ণনাটা তিনি দিয়েছেন তা বড় সাংঘাতিক। আলকাতরার মতো গাত্রবর্ণ, মোটর গাড়ির হেডলাইটের মতো তীব্র দুটো চোখ, গায়ে সজারুর মতো খোঁচা খোঁচা কাঁটা। পরনে রক্তাম্বর, গলায় রদ্রাক্ষের মালা। রুদ্রাক্ষের মালাটা দেওয়া ঠিক হল কিনা বুঝে উঠতে পারছেন না। জিনিসটা কাপালিকরা পরে। তবে ভূতেরা পরবে না, এমন কথা নেই। ভাবলেন, আপাতত থাক, পরে না হয় এর ওপর একটা মুন্ডুমালা দিয়ে দেবেন।

করালী যে খুব রোগা-পাতলা মানুষ তাও নয়। পেটানো চেহারা, গা-ভরতি গুলি গুলি মাসল, বাজখাঁই গলা। দু-ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের সংসার। একশো বিঘে ধানি জমি, পনেরো-বিশ বিঘে সবজি বাগান, মাছ কিলবিলে পুকুর পাঁচ-সাতটা। অভাব বলতে কিছু নেই। কিন্তু করালীচরণের দুঃখটা

অন্য জায়গায়। করালী লেখক। আর পাঁচটা হেঁজি-পেঁজি লেখকের মতো তিনি চোর, ডাকাত, গোয়েন্দা বা পরিদের গল্প লেখেন না। তাঁর একমাত্র বিষয় 'ভূত'। ভূতের গল্পে তিনি স্পেশালিস্ট। নয় নয় করেও অদ্যবধি শ'খানেক গল্প লিখে ফেলেছেন। কিন্তু দুঃখের কথা ছাপা হয়নি একটাও। পত্রিকা সম্পাদকেরা আর ভূতের গল্প ছাপতে চাইছে না। তাদের এক কথা, ভূতেদের দিনকাল গেছে। চারদিকে এত পিলপিলে লোক, জোরালো বৈদ্যুতিক আলো, লোকের আর ভূতে বিশ্বাস নেই।

তবে তিনি সবচাইতে আঘাত পেলেন কিছুদিন আগে। 'অশরীরী' নামে একটা পত্রিকা আছে যারা কিনা শুধুই ভূতের গল্প ছাপে। অনেক আশা নিয়ে একখানা জোরালো গল্প পাঠিয়েছিলেন সেখানে। সম্পাদক ভূতেশ নন্দী কথা দিয়েছিলেন গল্পটা ছাপা হচ্ছে। আনন্দের চোটে করালী পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনদের কাছে রাষ্ট্রও করেছিলেন খবরটা। ক'দিন আগে পত্রিকা দফতর থেকে হঠাৎ তার কাছে একটা চিঠি আসে। দুঃখ-টুঃখ প্রকাশ করে 'অশরীরী' সম্পাদক যা লিখেছেন তার মর্মার্থ এই যে, করালীবাবুর গল্পটা প্রেসে চলে গিয়েছিল; এমন সময় এক নবীন গল্পকার একটি গল্প নিয়ে আসে। সেটি এতই ভয়ঙ্কর যে স্বয়ং সম্পাদক পড়তে পড়তে চেয়ারে বসেই অজ্ঞান হয়ে যান। সুতরাং, সেই গল্প না ছেপে উপায় নেই। করালীচরণের গল্পটা তিনি পরে কোনওদিন ছেপে দেবার চেষ্টা করবেন; করালীবাবুর যেন কিছু মনে না করে—ইত্যাদি। পুনশ্চ দিয়ে সম্পাদক আরও লিখেছেন, প্রেসের কম্পোজার আর প্রুফ

রিডারও নাকি গল্পটি পড়াকালীন জ্ঞান হারায়।

সন্ধে হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। মেয়ে নিশাচরী বাটি ভরতি করে ফুরফুরে মুড়ি দিয়ে গেল করালীচরণকে। নৈবিদ্যির মাথায় সন্দেশের মতো, মুড়ির ওপর বড়সড় একটা চপ। দেখেই বোঝা যায় গরম, মনমাতানো গন্ধ পেলেন করালী। মনটা তার বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

এক গাল মুড়ি মুখে পুরে চপে একটা কামড় দিলেন করালীচরণ। আবেশে চোখদুটো বুজে এল। হঠাৎই চপটা হাত থেকে পিছলে বাটিতে পড়ে গেল। করালীচরণ তুলতে যাবেন, অমনি কে যেন বলে উঠল, 'ওহ্, বাঁ পা-টা একদম জখম করে দিলেন যে।'

বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল করালীচরণের। এদিক-ওদিক তাকালেন; কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না; ভাবলেন, মনের ভুল। চপটা ফের তুলতে যাবেন, ফের কে যেন বলে উঠল, 'দেখেছেন, আপনার সামনের দাঁতগুলো একেবারে দগদগে হয়ে বসে গেছে...।'

একটু কাঁপা গলায় করালীচরণ বললেন, 'ক্-কে!'

'আশ্চর্য তো, আজ সারাটাদিন আমায় নিয়ে পড়ে আছেন, আর আমাকেই চিনতে পারলেন না! নিবাস আমার চপের ভেতর।'

করালীচরণের বুকের মধ্যে কে-যেন ভুটভুটি ভ্যান চালিয়ে দিয়েছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনওরকমে বললেন, 'তাই নাকি?'

চপের ভেতর থেকে ভেসে এল,—'তা শান্তিতে একটু থাকব,

জো কী! চপ তো আমিও ভালোবাসতুম, কিন্তু এত নোলা ছিল না। হাতে পেলেই আপনারা সব এত বড়বড় কামড় বসান, সরে বসার টাইম পর্যন্ত পাই না...।'

একটু সামলে নিয়ে করালী বললেন, 'তা এত জায়গা থাকতে অমন বেয়াড়া জায়গায় ঠিকানা নিলে কেন?'

আমার দুঃখের কথা কী আর শুনবেন! গেল জন্মে সূক্ষ্ম দেহ পেয়েছিলুম। তা সূক্ষ্ম দেহ পেলেও বাসের তো একটা পাকাপোক্ত ঠেক চাই; এদিকে আবার নিরিবিলি জায়গার বড় অভাব; গাছপালা তো আপনারা সব মেরে কেটে সাফ করে দিলেন, হানাবাড়ি যেগুলো ছিল প্রোমোটার সব ফ্ল্যাট বানিয়ে ফেলেছে। তো হল কী, যেদিন জায়গার বিলিব্যবস্থা সেদিন আমার পৌঁছুতে একটু দেরি হয়ে গেল। যাবার পথে দেখি শিবু ময়রা চপ ভাজছে, লোভে পড়ে দু'খানা সরিয়ে খেয়ে ফেললুম। গিয়ে দেখি শাঁওড়া, তাল, বেল, নিম সব ভালো ভালো গাছ আগেই বিলি হয়ে গেছে। যে বুড়ো জায়গা বিলিবন্টন করছিল সে মানুষজন্মে মিলিটারি ছিল, পাকিস্তান বর্ডারে গুলি খেয়ে মরেছে। তা মিলিটারিম্যান যেমন হয়, খুব কড়া, ভীষণ রাগি, লেট একদম দেখতে পারে না। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলল, 'চপে যখন এতই নোলা, তখন চপেই থাক! সেই থেকে বড় কষ্টে আছি দাদা।'

করালীচরণ বুঝলেন, এ ব্যাটা ভূত হলেও নিরীহ গোছের। বুকে একটু বল পেলেন। বললেন, 'তা চপে থাকতে অসুবিধে কী, বেশ তো জায়গা...।'

'বলেন কী! সমস্যা কি একটা? একে তো ঘুপসি জায়গা, হাত-পা গুটিয়ে থাকতে হয়। তারপর যেটাতে থাকি, বিক্করি হয়ে গেলে অন্য চপে গিয়ে ঢোকো আবার। আপনি তো মনগড়া বর্ণনা দিয়েই খালাস। রং আমার কালো নয় মোটেও; শ্যামবর্ণ ছিলুম, ভাজা হতে হতে ফ্যাকাসে মেরে গেছি। চোখ জ্বালা তো দূরের কথা, ছানির জন্যে ভালো দেখতেই পাই না। গায়ে কিছু লোম ছিল বটে, সেসব এখন নেতিয়ে সুতো; আর আপনি লিখে দিলেন আমার গায়ে সজারুর মতো কাঁটা। লেখকদের বাস্তবজ্ঞানের বড় অভাব।'

করালীচরণ বললেন, 'এঃ হেঃ, তুমি এত বেচারি জীব সত্যি জানতুম না ভাই।'

'বেচারি বলে বেচারি! কত সমস্যা! মানুষের চপে বড্ড নোলা। তন্দ্রা এসেছে, একটু ঝিমুচ্ছি, অমনি কেউ একজন দিল পেল্লায় কামড়। হাত-পা একেবারে জখম। এই তো সেদিন, এক বুড়ো, নাতিকে ভাগ দিতে হবে বলে, চপটা গোটাগুটি মুখে ঢুকিয়ে দিল। আমার তো প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। ভাগ্যিস বুড়োর বাঁ-ধারের কষের দুটো দাঁত ফোকলা ছিল, আমি কোনওরকমে সুড়ুৎ করে গলে বাইরে আসি। এখনও গা-গতর টাটিয়ে বিষ।'

করালীচরণ খুব দুঃখ-দুঃখ গলায় বললেন, 'আহা রে!'

খুব কাতর স্বরে চপ-ভূত বলল, 'আপনার কাছে একটা আর্জি আছে লেখকমশাই।'

করালীচরণ একটু সতর্ক গলায় বললেন, 'কী?'

'আপনার পুকুরের পশ্চিমপাড়ের যে বুড়ো তালগাছটা কাটার

কথা ভাবছেন, আমি বলি কী, ওটা থাক। সামান্য একটা গাছ বেচে আপনি আর ক'পয়সা পাবেন! ভাবছি আমি, ওটাতে আস্তানা গাড়ব, বেশ নিরিবিলি শান্তির জায়গা।'

করালীচরণের মাথায় ধাঁ-করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বললেন, 'ঠিক আছে; তালগাছ কাটব না; আমার কিন্তু একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'বলেন, বলেন!'

'এই গল্পটা একটা পত্রিকায় পাঠাচ্ছি। সম্পাদককে ভয় দেখিয়ে, বা যে করেই হোক ছাপাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

'এ আর এমন কী কথা; হয়ে যাবে, আপনি নিশ্চিত থাকুন।'

'ঠিক তো!'

'একদম ঠিক, একশোবার ঠিক! আজ আসি, আপনি তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিন ওটা...।'

করালীচরণ দেখলেন একটা মৃদু বাতাস টেবিলের কাগজপত্রকে একটু কাঁপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। তিনি একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কিন্তু মনে একটা খটকাও থেকে গেল। বড্ড নিরীহ গোছের চেহারা। সম্পাদক ভয় পেলে হয়!

ভাবতে ভাবতে আধখাওয়া ঠান্ডা চপে সাবধানে ছোট্ট একটা কামড় বসালেন সাহিত্যেক করালীচরণ।

বাকরুদ্ধ বাগ্‌বাহাদুর

পরাশরবাবুর ভেবেছিলেন আড়ংধোলাই খাবেন; তার বদলে পেলেন রজনীগন্ধার মালা, ব্যাপক হাততালি আর একবাক্স মিষ্টি।

সেদিন সন্ধেবেলা পাড়ার ফাংশানে পরাশরবাবু একজন নিরীহ স্রোতা হিসেবে হাজির ছিলেন। পরাশরবাবু অবসর নিয়েছেন মাত্র কিছুদিন। এখন সময় কাটানো তাঁর কাছে মস্ত বালাই। সকালবেলাটা বাজার করে, খবরের কাগজ পড়ে কেটে যায়; দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর দিবানিদ্রা দেন; বিকেলে গাছের পরিচর্যায় থাকেন।

সমস্যা বেশি হয়, সন্ধেগুলোকে নিয়ে। কী করবেন, কোথায় যাবেন—ভেবে পান না কিছুতেই। এই পাড়ায় ভাড়াটে হয়ে নতুন এসেছেন। ফলে বন্ধুবান্ধব বিশেষ কেউ নেই এখানে। গিন্নি আর বউমা টিভি সিরিয়ালে বুঁদ হয়ে থাকে। দু-একবার সিরিয়াল দেখার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু খুব জুৎসই মনে হয়নি। চরিত্রগুলো কে কার সঙ্গে সম্পর্কিত, তাদের দাবি কী, তারা খামোখা কেন সর্বদা চিৎকার করে, রাগ দেখায় বা চোখের জল ফেলে, কিছুতেই বোধগম্য হয় না তাঁর।

গিন্নি বা বউমাকে জিগ্যেস করে জানার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে থাকে এইসময়, কিছু

কানে ঢোকে না তাদের; খুব বেশি জিগ্যেস করলে তাঁর আনতাবড়ি প্রশ্নে বিরক্ত হয় এবং খেঁকিয়ে ওঠে। চোখের সমস্যার জন্যে রাতে পড়াশোনাও করতে পারেন না।

অগত্যা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন তিনি। রাস্তাঘাটে ঘোরেন, গাড়ি-ঘোড়া-লোকজন দেখেন, পথকুকুরকে নেড়ো বিস্কুট খাওয়ান, আর কোথাও গানবাজনা হলে ঢুকে পড়েন। নাচ, গান, কবিতা শুনতে শুনতে দিব্যি কেটে যায় সময়টা।

সেদিন তেমনই গিয়েছিলেন একটা ফাংশানে। গিয়ে দেখলেন তাঁর বাড়িওয়ালা নরোত্তমবাবু এই ফাংশানে হর্তাকর্তা। নরোত্তমবাবু অধিক খাতির করে তাঁকে একেবারে সামনের সারিতে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

বেশ শুনছিলেন গান, বাজনা। কেলেঙ্কারিটা ঘটে গেল হঠাৎই। একজন শিল্পী গান গাইছিলেন। গানের পরেই বিখ্যাত এক নাচের দলের নৃত্য পরিবেশ করার কথা। কোনও কারণে গানগুলো দর্শকদের ঠিক মনোমতো হচ্ছিল না। প্রথমে তারা হইহল্লা করে, হাততালি দিয়ে তাদের বিরক্তি প্রকাশ করল।

কিন্তু সেই শিল্পী আবার একটু নেআঁকড়ে ধরনের। দর্শকদের বিরক্তিকে আমল না দিয়ে একটার পর একটা গান গেয়ে যাচ্ছিল। শেষে দর্শকদের চূড়ান্ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। মুহুর্মুহু পচা ডিম নিক্ষিপ্ত হতে লাগল স্টেজে। এবার রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হলেন গায়ক; কোনওক্রমে হারমোনিয়াম দিয়ে মাথা আড়াল করে নেমে গেলেন স্টেজ থেকে। কিন্তু তার পরেই শুরু হল আসল সমস্যা। রাস্তায় যানজট থাকায় নাচের দলটা তখনও এসে পৌঁছোয়নি।

কিন্তু স্টেজ তো আর ফাঁকা রাখা যায় না। দর্শকরা তাহলে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। ভাঙচুর বা অগ্নিসংযোগও বিচিত্র নয়। এদিকে কেউই আর সাহস করে স্টেজে উঠতে চাইছে না।

ঠিক তখনই স্বয়ং নরোত্তমবাবু এসে পরাশরবাবুকে অনুরোধ করলেন স্টেজে উঠতে।

পরাশরবাবু ভয়ানক অবাক হয়ে বললেন, 'স্টেজে উঠে আমি কী করব?'

'যাই হোক করুন।' নরোত্তমবাবু বললেন, 'নাচ, গান, আবৃত্তি, মূকাভিনয়, যোগব্যায়াম, হাস্যকৌতুক, কুইজ, ম্যাজিক—যা ইচ্ছে করুন, মোটকথা দর্শকদের ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণ।'

পরাশরবাবু করজোড়ে জানালেন, তিনি এসবের বিন্দু বিসর্গও জানেন না। তিনি তো কোন ছার, তাঁর ঊর্ধ্বতন চোদ্দোপুরুষেও এসবের চর্চা নেই।

নরোত্তমবাবু বললেন, 'তাহলে বক্তৃতা করুন।'

পরাশরবাবু বললেন, বক্তৃতাও তিনি কস্মিনকালে করেননি।

এবার একটু রাগান্বিত গলায় নরোত্তমবাবু যা বললেন তার সরলার্থ করলে দাঁড়ায় যে, বক্তৃতা অত্যন্ত সহজ কাজ, তার জন্যে কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন পড়ে না। আর তিনি যদি এই বিপদের দিনে তাঁকে রক্ষ না করেন তবে নরোত্তমবাবুও তাঁর ভাড়াটে বিষয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করবেন। কারণ রোজই তাঁর কাছে আরও বেশি ভাড়া দেবার প্রস্তাব নিয়ে

অনেকেই আসছে।

এর পরও পরাশরবাবু হাত জোড় করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু সে সুযোগ তিনি পেলেন না। কয়েকজন বলিষ্ঠ চেহারার কর্মকর্তা তাঁকে একপ্রকার চ্যাংদোলা করে স্টেজে তুলে দিল।

পরাশরবাবু শুনতে পেলেন মাইকে ঘোষণা হচ্ছে—এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন, যিনি দেশ-বিদেশের বহু মঞ্চ কাঁপিয়ে দিয়েছেন বক্তৃতা করে, সেই পরাশর পতিতুন্ডু।

বিদেশের কথা শুনেই বোধহয় দর্শকরা সাময়িকভাবে একটু শান্ত হল। এদিকে পরাশরের জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। যে-কোনও মুহূর্তে ধেয়ে আসতে পারে পচা ডিম; আবার নেমে গেলে বাস্তুচ্যুত হবার প্রবল সম্ভাবনা। শিকাগোর বিবেকানন্দের থেকেও জটিল পরিস্থিতি।

এমত অবস্থায় বলবেন কী—কিছুই যে মনে আসছে না তাঁর; এমনকী পিতৃপিতামহের নামধাম পর্যন্ত ভুলতে বসেছেন। অসহায় চোখে এদিক ওদিক তাকালেন। স্টেজে তিনি, সামনে মাইক্রোফোন আর আশপাশে ক'টা ফাটা পচা ডিম যা থেকে তীব্র গন্ধ আসছে।

হঠাৎ কিছুদিন আগে কোনও একটা ম্যাগাজিনে কড়া পচা ডিম বিষয়ক একটা নিবন্ধের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

পচা ডিম যে অতি মূল্যবান একটা বস্তু—পচা ডিম থেকে ভালো সার, উৎকৃষ্ট শ্যাম্পু, বা তীব্র কীটনাশক তৈরি করা যেতে পারে, এবং পচা ডিমের পুষ্টিগুণ টাটকা ডিমের চাইতে বেশি,

একবার যদি নাক টিপে খেয়ে নেওয়া যায় তবে অশেষ উপকার; আফ্রিকার কোন একটা উপজাতি পচা ডিম খায়। দেখা গেছে তাদের গড় আয়ু পৃথিবীর বাকি জনগোষ্ঠীর চেয়ে অনেক বেশি; অর্থাৎ পচা ডিম অনেকটা মরা হাতির মতো! এইসব ছিল ওই নিবন্ধের বক্তব্য।

পরাশরবাবুর একটা গুণ হল—তাঁর স্মৃতিশক্তি চমৎকার। একবার যা পড়েন বা শোনেন হুবহু মনে থাকে। অনন্যোপায় পরাশরবাবু দর্শকদের সম্ভাষণ করে পচা ডিম বিষয়ক সেই নিবন্ধটা গড়গড় করে বলে গেলেন। বলতে বলতে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলেন, দর্শকরা একেবারে চুপ। খুব মন দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনছে। নিবন্ধটা শেষ পর্যন্ত বলে, দর্শকদের আরও একবার নমস্কার জানিয়ে এবং তাঁকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য শেষ করলেন।

স্টেজ থেকে নামতেই কে যেন একট রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে দিল গলায়, আর আবেগে থরথর নরোত্তমবাবু বুকে টেনে নিলেন তাঁকে, নরোত্তমবাবুর চোখে জলও যেন লক্ষ করলেন পরাশর।

সে যাত্রায় রক্ষা পেলেও ফের বিপদ ঘনিয়ে এল পরাশরবাবুর জীবনে। আবার সেই নরোত্তমবাবু। তিনদিন পর সকালবেলা নরোত্তমবাবু কয়েকটা ছেলে-ছোকরা নিয়ে হাজির। ক্লাবের ছেলে সব। তবে এটা অন্য ক্লাব। নরোত্তমবাবুর শালা এই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। আবার স্টেজে উঠে বক্তৃতা দিতে হবে পরাশরবাবুকে। এবার আরও একধাপ এগিয়ে কাজ করেছে এরা। প্রধান বক্তা

হিসেবে পরাশরবাবুর নাম ছাপিয়ে দিয়েছে প্রচারপত্রে। পরাশরবাবু প্রথমে ভেবেছিলেন, উদ্দিষ্ট দিনে পালিয়ে যাবেন বাড়ি ছেড়ে। কিন্তু তার পরেই ভয় হল, ফিরে এসে হয়তো দেখবেন বাড়িতে তালা। অতি অল্প ভাড়ায় এই বাড়িটা পেয়েছেন তিনি। ফলে গৃহত্যাগের পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন। কিন্তু নাওয়া-খাওয়া-ঘুম মাথায় উঠল তাঁর। পচা ডিম একবার রক্ষাকবচ হয়ে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু বারবার তো হবে না।

হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা সম্ভাবনার উদয় হল। আচ্ছা, বক্তৃতা কি আদৌ কেউ শোনে? মনে হয় না। নচেৎ, সেদিন তিনি যা বলেছিলেন তাতে করে তাঁর হাড়গোড় একটাও আস্ত থাকার কথা নয়।

এই সম্ভাবনাটাকে সম্বল করেই পরাশরবাবু হাজির হলেন অনুষ্ঠানে। এবং বুক ঠুকে উঠেও পড়লেন স্টেজে। তারপর যথারীতি সম্ভাষণের পর ক্লাস নাইনে পড়া প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান রচনাটা টানা মুখস্থ বলে গেলেন।

এবং কী আশ্চর্য! এবারও বক্তৃতা শেষ হবার পর ব্যাপক হাততালি আলিঙ্গন আর অভিনন্দন।

ব্যস! আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর বাগ্মীতার খ্যাতি। দূর-দূরান্ত থেকে আমন্ত্রণ আসতে লাগল বক্তৃতা দেবার জন্যে। তিনিও তখন বেপরোয়া। পাড়ার জলসা, স্কুল-কলেজের ফাংশান, ধর্মীয় সভা, ফুটবল-ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক মঞ্চ সমস্ত জায়গায় তিনি দাপিয়ে বক্তৃতা করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি

বক্তৃতার জন্যে পারিশ্রমিক ধার্য করলেন। ঘণ্টা পিছু রেট। দিনে দিনে নিজের বক্তৃতাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেলেন। টানা গদ্য না বলে মাঝে মাঝে কিছু কবিতা বা সংস্কৃত শ্লোক ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন। লক্ষ করলেন, এতে হাততালির বহর বাড়ে।

একবার এক মহিলা সমিতির অনুষ্ঠানে বক্তৃতা শুরু করলেন মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ আউড়ে, তারপর সেদিনের কাগজে পড়া ওয়েদার রিপোর্টটা গড়গড় কর আউড়ে, বিয়ের মন্ত্র দিয়ে বক্তৃতা শেষ করলেন।

মহিলা সমিতির নেত্রী এত আপ্লুত হয়ে গেলেন যে, পরের বছরের অনুষ্ঠানের জন্যে অ্যাডভান্স করে দিলেন তখনই। তারপর এক রাজনৈতিক দলের সভায় শুরু করলেন টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটিল স্টার দিয়ে, তারপর মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো ঝাড়া মুখস্থ বলে, শেষে পিতৃশ্রাদ্ধের মন্ত্রটা মনে ছিল, সেটা আউড়ে দিলেন। পরদিন স্থানীয় একটা সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসাসহ ছবি ছাপা হল তাঁর। বলা হল, বক্তৃতার ক্ষেত্রে তিনি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। তাঁকে 'বাগ্‌বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করল তারা।

এরকমই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ ঘটে গেল সেই মারাত্মক কাণ্ড। সকালবেলা খবরের কাগজ পড়ছিলেন পরাশরবাবু। এখন খবরের কাগজটা বেশ খুঁটিয়ে পড়েন তিনি। তেমন তেমন সংবাদ পেলে মুখস্থ করে নেন; বক্তৃতার কাজে লাগে। পরশুই তো একটা তবলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাদশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বক্তৃতা করে এলেন। সেদিনই কাগজে একটা খবর ছিল—কোথাকার এক

ভিখারি পয়সা জমিয়ে লটারির টিকিট কিনেছিল; দেখা গেল তার ভাগ্যেই প্রথম পুরস্কার। সেই গল্পটা বলে; তারপর 'দুই বিঘা জমি' আউড়ে বক্তৃতা শেষ করেছিলেন পরাশরবাবু।

হঠাৎ ডোরবেল। দরজা খুলে দেখলেন রোগাভোগা একটা লোক দাঁড়িয়ে। পরনে অতি জীর্ণ পোশাক। পরাশরবাবু প্রথমে ভেবেছিলেন কোনও সাহায্যপ্রার্থী হবে। কিন্তু ভেতরে আসার অনুমতি চাইতে ভাবলেন—সংগঠক। পরাশরবাবু পরিষ্কার বলে দিলেন, এক মাসের মধ্যে তাঁর কোনও ডেট ফাঁকা নেই। লোকটা খুব বিনয়ের সঙ্গে জানাল সে কোনও সংগঠক নয়। তারপর বলাকওয়া নেই পরাশরবাবুকে ঢিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে বলল, আপনার ঋণ যে আমি কী করে শোধ করব..!'

'হা-হা' করে বাধা দিয়ে পরাশরবাবু বললেন, 'কিন্তু আমি তো আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না!'

লোকটা বলল, পরশু আমি তবলা ক্লাবে আপনার বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম।

পরাশরবাবু বললেন, 'বাহ্, বেশ, বেশ। আপনি বোধহয় তবলচি?'

লোকটা বলল, 'না না, তবলচি নয়। আমি ভিক্ষে-দুঃখু করে খাই। কোথাও অনুষ্ঠান দেখলে ঢুকে যাই, অনেক সময় বিনি পয়সায় চা জুটে যায়।'

'ও আচ্ছা!' পরাশরবাবু বললেন, 'কিন্তু ঋণ শোধের ব্যাপারটা তো ঠিক এখনও মানে...আমি তো আপনাকে টাকাপয়সা দিয়েছি বলে মনে পড়ছে না!'

লোকটা বলল, তা একরকম টাকাই দিয়েছেন আপনি আমাকে! তবে অনেক বেশি টাকা—একেবারে দশ লাখ!'

'দশ লাখ!' পরাশরবাবু ভাবলেন, লোকটা পাগল-টাগল না কি!'

লোকটা বলল, 'আপনার বক্তৃতা শুনেই তো লটারির টিকিটটা কেটে ফেলি; আর আজ দেখি একেবারে ফার্স্ট প্রাইজ—দশ লাখ! কী বলে যে আপনাকে...।'

লোকটা পরাশরবাবুর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে প্রণাম করে ফের।

এবার বাধা দিতেও ভুলে যায় পরাশরবাবু। তাঁর শিরদাঁড়া দিয়ে হিমেল একটা স্রোত নেমে যাচ্ছে। ভয়ে। প্রচণ্ড ভয় লাগছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল, কেউ তাহলে বক্তৃতা শোনে? একজন হলেও শোনে? সর্বনাশ! তাঁর ধারণা ছিল বক্তৃতা কেউ কোথাও কোনওদিন শোনে না।

বক্তৃতা করতে গিয়ে এতদিন তিনি যা যা বলেছেন, তাতে করে দাঙ্গাহাঙ্গামা, মহামারি, সুনামি, দেশভাগ, উল্কাপাত, সবকিছু ঘটে যেতে পারত।

একে একে সব মনে পড়ে যাচ্ছিল তাঁর—কিছুদিন আগে একটা স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নিরাপদে টুকলি করার উপায়, যা তিনি স্কুলজীবনে এক ফাঁকিবাজ বন্ধুর থেকে শুনেছিলেন, সেটাই বলে এসেছিলেন হুবহু; তারপর স্থানীয় থানার ক্রীড়া অনুষ্ঠানে, পুলিশের ঘুষ খাবার প্রবণতা বিষয়ে পড়া একটা সমীক্ষা গড়গড় করে বলে এসেছিলেন। এসব যত মনে পড়তে

লাগল তত যেন হাত-পা ঠান্ডা হতে লাগল।

এর পরই বক্তৃতা করা ছেড়ে দিলেন পরাশরবাবু। বেপরোয়া বক্তৃতা করার আত্মবিশ্বাসটাই চলে গেল তাঁর। সংগঠকরা অনুরোধ নিয়ে এলেই হাত জোড় করে মার্জনা চাইতেন। তারপর ইশারায় জানিয়ে দিতেন তাঁর গলায় ভয়ানক একটা রোগ ধরা পড়েছে—কথা বলা একেবারে নিষেধ।

চাঁদুর হাতে হ্যারিকেন

চাঁদুর চাঁদি গরম। বিশ্বকাপ এভাবে হাতে হ্যারিকেন ধরিয়ে দেবে আগে জানলে সে বিশ্বকাপটারই একটা গতি করে দিত।

চাঁদু হল গিয়ে একজন চাবুক চোর। লোকে বলে জাত চোর; কেউ কেউ আবার বলে বজ্জাত চোর। ব্যাটা কম লোকের সব্বোনাশ করেছে!

তা চাঁদু সেটা মেনেও নেয়। কিন্তু যে খেলার যা নিয়ম। তাকেও বউ-ছেলেপুলে পালতে হয়। কিছু লোকের ট্যাক ফাঁকা হয় বলেই তার দু-বেলা দু-মুঠো জোটে। তাছাড়া এ তো আর ফোকটে রোজগার নয়; মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। তার গুরু ছিল টকা ওস্তাদ। তার কাছে চাঁদু দস্তুর মতো নাড়া বেঁধে ট্রেনিং নিয়েছে। খুব রগড়ানির সেসব ট্রেনিং। ট্রেনিং-এর ধমকে কত আচ্ছা আচ্ছা লোকের আধ-হাত জিভ বেরিয়ে যায়। কিন্তু চাঁদুর জন্মই এ কাজের জন্যে। ট্রেনিং শেষে পরীক্ষায় সে ফার্স্ট। টকা পিঠ চাপড়ে বলেছিল, আমার আশীর্বাদ রইল, তোর ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না কোনওদিন—আমার নামটা রাখিস।

তা বলতে নেই, চাঁদু দিনে দিনে গুরুর মুখ উজ্জ্বল করেছে। রাতে বেরিয়ে কোনওদিন খালি হাতে ফিরতে হয়নি। এমন ঘুমপাড়ানি মন্ত্র ছাড়ে যে গেরস্ত একেবারে কাদার তাল। মালকড়ি

হাতিয়ে গুনগুন করে কালী-কেত্তন গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরে আসে চাঁদু।

কিন্তু মাসখানেক হল তার কারবারে লালবাতি। এ তল্লাটে সবাই নিশাচর হয়ে গেছে। রাতভোর ছেলেবুড়ো সক্কলে টিভির সামনে। পাড়াময় যেন মোচ্ছব। চিৎকার-চেঁচামেচি, মাঝে-মাঝে বোম ফাটানো, মাঝরাতে রাস্তায় বেরিয়ে ছেলে-ছোকরাদের উদ্দাম নাম—চাঁদু ঘাপটি মেরে দেখে আর ভাবে হলটা কী! এভাবে চললে তো শিগগিরিই কারবারে লাল বাতি জ্বলে যাবে। তাই, চাঁদু খোঁজ-পাত্তা লাগাল। শুনল, কোথায় বিশ্বকাপ না কী যেন একটা হচ্ছে আর তাতেই পাড়া গরম।

চাঁদু ভাবছে একদিন টকা ওস্তাদের কাছে যাবে। তাদের ট্রেনিং-এ কুকুর থেকে মুগুর সবকিছু সামলাবার কায়দা বাতলে দিয়েছিল; কিন্তু বিশ্বকাপ! উঁহু, চাঁদু স্মরণ করতে পারছে না।

এর মধ্যেই একদিন সুযোগ বুঝে ভ্যাবলা মণ্ডলের বাড়ি ঢুকেছিল চাঁদু। রান্নাঘরে একগোছা বাসন-কোসন। সবেমাত্র হাতটা বাড়িয়েছে অমনি 'গো-ও-ওল' বলে একটা বিকট চিৎকার উঠল। ঘাবড়ে গিয়ে পড়িমড়ি করে পালিয়ে এল চাঁদু।

আর একদিন ভালো সুযোগ এসেছিল। রুইদাস সামন্তর বাড়ির লোকজন সব টিভিতে মশগুল। সিঁড়ির ঘরে ঢুকে চালের বস্তাটা চাঁদুরা সবে মাথায় চাপিয়েছে হঠাৎ কয়েকজন 'কাকু, কাকু' বলে কারা যেন কাকাকে ডাকতে লাগল। কে যেন আবার 'দিদা, দিদা' বলে ডাকছে। একজন হেঁড়ে গলায় চিৎকার করছে, মার মার, মেরে শুইয়ে দে, ফাউল...। চাঁদু ভাবল নিশ্চয়ই তাকে বলছে।

কোনও রকমে পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে এসেছিল সে।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলে। এরপর তো কপালে হরিমটর। ছেলেমেয়েগুলো শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায়, বউ-ঝামটা দেয় আর রাতের পর রাত এ-বাড়ি, সে-বাড়ি উঁকি দিয়ে ফিরে আসে চাঁদু।

সেদিনও ভোররাতে চাঁদু মনমরা হয়ে ফিরছিল। একহাঁটু ধুলো, চোখ লাল, চুল উসকো-খুসকো। যদু পোদ্দারের বাড়ির এসে থমকে গেলে। বৈঠকখানার দরজা হাট করে খোলা আর ঘরের মেঝেতে পেটমোটা একটা বস্তা। ধারেকাছে জন-মনিষ্যি নেই। বস্তাটা যেন তার জন্যেই গ্যাঁট হয়ে বসে অপেক্ষা করছে। সট্ করে ঘরে ঢুকে বস্তাটা পরখ করে চাঁদু। ভেতরে চাল আর নারকোল। আর সময় নষ্ট করেনি চাঁদু।

বস্তা মাথায় চাঁদু চলেছে। মনটা তার ভারি খুশিখুশি। বেশ বড় একটা দাঁও মারা গেছে। আজই বেরবার সময় বউ বাপেরবাড়ি চলে যাবে বলে শাসিয়েছে। যাক, কিছুটা তো মুখরক্ষা হল! ফুর্তিতে অনেকদিন পর গুনগুন করে একটা কালী-কেত্তন ধরে চাঁদু। কেত্তনটা তার গলায় খেলে ভালো।

কিন্তু একটু পরে চাঁদুর মনে হল কেউ একজন আসছে তার পেছনে। ভালো করে খেয়াল করে সে। হ্যাঁ, আসছে বটে একজন হ্যারিকেন হাতে। চাঁদু ভাবে, কে না কে হবে! ভোররাতে বাগানে যাবে বোধহয়।

বড় রাস্তা ছেড়ে বাড়ির পথ ধরে চাঁদু। ছেলেপুলের মা এখনও নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। অনেকদিন পর তার মুখে হাসি ফুটবে। কিন্তু খানিক যেতে না যেতেই পেছনে সেই পায়ের শব্দ। এবার একটু

ঘাড় ঘুরিয়ে আড়চোখে দেখে চাঁদু।

সব্বোনাশ! এ যে যদু পোদ্দার। ব্যাটা বুঝতে পেরেছে না কি! হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয় চাঁদু। বুঝতে পারে যদু পোদ্দারও গতি বাড়িয়েছে। বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে চাঁদু। কিন্তু পেছনেই যদু। এখন তো আর বাড়ি ঢোকা যায় না। চাঁদু তাই বাড়ি ফেলে ঘোষপাড়ার দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু ঘোষপাড়ার শেষ মাথায় এসে দেখে তখনও পিছু ছাড়েনি পোদ্দার।

তাই হাঁটতেই থাকে চাঁদু। ঘোষপাড়ার পর রায়পাড়া, তারপর মোল্লাপাড়া, কিন্তু পেছন ফিরলেই দেখে হ্যারিকেন হাতে যদু পোদ্দার।

পা ধরে গেছে চাঁদুর। ঘাড়ে ব্যথা। একবার ভাবল মায়া ত্যাগ করে বস্তাটা ফেলে দৌড় দেবে। কিন্তু তাতে যদু যদি চিৎকার শুরু করে। তখন সে আরও কেলেঙ্কারি। ভাবতে ভাবতে দাসপাড়া ছাড়িয়ে চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়ে ফের বড় রাস্তায় পড়ে চাঁদু।

সারা গা ঘামে ভিজে জবজব করছে, বুকে টান ধরেছে, তবু থামার উপায় নেই। বড় রাস্তা ধরে এগোতে থাকে চাঁদু। পেছনে যদু পোদ্দার।

ক্রমশ ভোরের আলো ফুটে উঠছে। গাছে গাছে পাখির দল ক্যাঁচোর-ম্যাঁচের করছে। রাস্তার মোড়ে টিপ-কলের সামনে দুধে জল মেশাচ্ছে মাধব গয়লা। রায়েদের বড়-পুকুরে ডুব দিয়ে মন্ত্র জপ করতে করতে ফিরছে নিমাই ঠাকুর। চাঁদুর পা দুটো থরথর করে কাঁপছে।

দেখতে দেখতে রেলস্টেশন এসে পড়ে। ওহ্, এখনও পেছনে

যদু পোদ্দার। আর পারছে না চাঁদু, এবার ঠিক অজ্ঞান হয়ে যাবে সে।

'যা থাকে কপালে' বলে ধপাস করে রাস্তার ওপর বস্তাটা ফেলে দেয় চাঁদু। হাঁ করে বড় বড় শ্বাস নিতে থাকে।

কাছে এসে দাঁড়ায় যদু পোদ্দার। বলে, এখানে নামালি যে! প্ল্যাটফর্মে তুলে দে বাবা, গাড়ির সময় হয়ে এল।

বলে কী লোকটা! খাবি খেতে খেতে বোঝার চেষ্টা করে চাঁদু।

পোদ্দার বলে, সত্যিই বাবা তোর দয়ার শরীর। দেখ না; এই চাল আর নারকোলগুলো মেয়ের বাড়ি নিয়ে যাব; এতটুকু মোটে রাস্তা, অথচ একটা ভ্যান-রিকশা ডাকলে এককাঁড়ি টাকা নিয়ে নেবে। গরিব মানুষ আমি, কোথা থেকে পাই বল? নেহাত তোর মতন উপকারী ছেলে দু-একটা আছে তাই রক্ষে...তা বাবা, অত ঘুরপথে এলি কেন, আর মাঝে মাঝে অমন ছুটছিলিই বা কেন?

চাঁদু তখনও বোয়াল মাছের মতো হাঁ করে হাঁপাচ্ছে।

যদু পোদ্দার তাড়া দেয়, নে বাপ, আর একটু কষ্ট করে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দে বাবা বস্তাটা।

চাঁদু হঠাৎ কাছাটা বাগিয়ে চোঁ-চোঁ করে দৌড় দেয়।

আর যদু পোদ্দার পেছন থেকে গলা তুলে চিৎকার করে, ওরে বাবা চাঁদু, যাস কোথা; হ্যারিকেনটা অন্তত নিয়ে যা, তোর খুড়িমাকে গিয়ে ফেরত দিবি...।

ভূত ধরলেন বিনোদবিহারী

প্রোফেসার বিনোদবিহারী টেনশন শুরু হল। টেনশন হলেই তাঁর হার্টবিট বেড়ে যায়, প্রবল ঘাম হয় এবং বাঁই-বাঁই করে মাথা ঘুরতে থাকে। মোটের ওপর, কাজকর্ম ভণ্ডুল। অথচ সময়টা এমনই যে, কাজ না করলে সব গুবলেট হয়ে যাবে। নিজের সুনাম যাবে, সরকার আর দেশের পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

বিনোদবিহারী ঠিক করলেন, হার্টটা বদলে নেবেন। যদিও তাঁর হার্টটা এক্সপায়ারি ডেট ফেল করেনি, কিন্তু একটু আগেভাগেই বদলে নেওয়া ভালো। বেশ কিছুদিন হল বড্ড ধকল যাচ্ছে এটার উপর। কারণটা আর কিছুই নয়, একজোড়া ভূত। একজোড়া ভূত জোগাড় করতে গিয়ে প্রোফেসর বিনোদবিহারী একেবারে নাজেহাল। এই একুশশো তিপ্পান্ন সালে সরকার থেকে ঠিক করা হয়েছে, বাংলাদেশের কিছু লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যশালী জিনিসের একটা মিউজিয়াম বানাবে। যেমন, রয়াল বেঙ্গল টাইগার। একসময় ওয়েস্ট বেঙ্গলের দক্ষিণ দিকে সুন্দরবন নামে অতি বিশাল এক ম্যানগ্রোভ অরণ্য ছিল। সেখানেই দেখা যেত অনিন্দ্যসুন্দর রাজকীয় শৌর্যের এই প্রাণীটিকে। কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য সুন্দরবন এখন জলের তলায়। আর রয়াল বেঙ্গল টাইগারও বিলুপ্তির পথে।

একজোড়া রয়াল বেঙ্গল রাখা হচ্ছে মিউজিয়ামে। তেমনই ন্যাদোস মাছ। অতি সুস্বাদু এই মাছ একসময় বাংলার খাল-বিলে কিলবিল করত। কিন্তু এখন গোটা দেশ টুঁড়ে ফেললেও চোখে পড়ে না। বহু কষ্টে কয়েকটা মাত্র জোগাড় করে রাখা হচ্ছে মিউজিয়ামের অ্যাকোয়ারিয়ামে। টিকিট কেটে জনসাধারণকে দেখতে হচ্ছে ন্যাদোস মাছ।

প্রোফেসর বিনোদবিহারীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভূতের। বাংলার ভূতের সুনাম একসময় ছড়িয়ে ছিল সারা দুনিয়ায়। কতরকম ভূত যে ছিল এখানে! তাদের আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্রও কতরকমের। ব্রহ্মদৈত্যের মেজাজের সঙ্গে মেছো ভূতের মেজাজ একেবারেই খাপ খায় না। মামদোর ভাবগতিক আবার সম্পূর্ণ আলাদা। শাঁকচুন্নি আর পেতনির মধ্যেও বিস্তর ফারাক। কিন্তু সেসব দিন গিয়েছে। চারদিকে এত গিজগিজে লোক, থাম্বা-থাম্বা অট্টালিকা, ঝকঝকে আলো যে, ভূতেরা একটু-একটু করে কমতে-কমতে এখন একেবারে তলানিতে। তাই সরকার থেকে প্রোফেসরকে বলা হয়েছে, 'খুঁজেপেতে একজোড়া জোগাড় করে আনুন, এনি টাইপ অফ গোস্ট, অফ এনি স্পিসিস।'

বিনোদবিহারী কয়েকজন সহকারীকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। অতি সংবেদশীল জিডিডি (গোস্ট ডিটেক্টর ডিভাইস) নিয়ে তারা টুঁড়ে ফেলছে গোটা দেশ। এই জিডিডি এমন যন্ত্র, যেটা কাছাকাছি ভূত থাকলে তার অস্তিত্ব নিখুঁতভাবে জানিয়ে দেয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। রোজ ব্যর্থ সংবাদ আসছে, 'না স্যার, ভূতের গন্ধটুকুও নেই কোথাও।'

প্রোফেসার বিনোদবিহারী ঠিক করলেন অ্যাসিস্ট্যান্টদের ওপর ভরসা না করে নিজেই মাঠে নামবেন। কিন্তু তার আগে হার্টটা বদলে নেওয়া দরকার। ওয়েস্ট বেঙ্গলের হার্ট-ব্যাঙ্কের ওপর খুব একটা আস্থা নেই তাঁর। এখানকার হার্টগুলো একটু পলকা ধরনের, খুব একটা চাপ সহ্য করতে পারে না। সম্প্রতি পাঞ্জাবে ভালো একটা হার্ট-ব্যাঙ্ক হয়েছে, যে-কোনও হার্টের উপর একশো বছরের ওয়ারান্টি দেওয়া হচ্ছে। নিজের সৌরচালিত ছোট্ট গাড়িটা বের করলেন বিনোদবিহারী। এখন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে সেভেন-টাওয়ার ফ্লাইওভার, অর্থাৎ একটা ফ্লাইওভারের ওপর আর-একটা, এইভাবে পরপর সাতটা। গাড়ি চালিয়ে সবচেয়ে উপরেরটায় চলে এলেন বিনোদবিহারী। তারপর চারশো পঞ্চাশ কিলোমিটার গতিতে গাড়ি ছোটালেন অমৃতসরের দিকে।

হার্ট-ব্যাঙ্কের পার্কিং জোনে গাড়ি পার্ক করে একটু এগোতেই প্রোফেসর গোবিন্দলাল বর্মনের সঙ্গে দেখা।

গোবিন্দলাল বর্মনের ওপর ভোঁদড়ের দায়িত্ব ছিল। যত দূর জানেন বিনোদবিহারী, গোবিন্দলাল লুপ্তপ্রায় বাংলাদেশি ভোঁদড় জোগাড় করে ফেলেছেন। নিউজ চ্যানেলগুলোতে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল সংবাদটা। কারণ আর কিছুই নয়, কয়েকটি বিতর্কিত প্রশ্ন উঠেছিল ভোঁদড় দুটোকে নিয়ে। গোবিন্দলাল ভোঁদড় দুটোকে ধরেছিলেন আফ্রিকার জঙ্গল থেকে। প্রশ্ন উঠেছিল, আফ্রিকার জঙ্গলে বাংলাদেশি ভোঁদড় আসে কী করে? শেষে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল গেল, স্টিভ হ্যামিলটন নামে

এক খামখেয়ালি সাহেব ছিলেন বহু বছর আগে। জন্তু-জানোয়ার নিয়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত পরীক্ষা চালাতেন। যেমন কুমিরের জ্বর মাপতেন, বাঁদরের ব্লাডপ্রেশার দেখতেন, ছাগলের লিভার ফাংশান টেস্ট করতেন। সেসব আবার তৎকালীন কিছু চ্যানেল প্রচারও করত। তা সেই সাহেব গবেষণার কাজে ক'টা বাংলাদেশি ভোঁদড় দেশে নিয়ে যান। এই ভোঁদর দুটো তাদেরই সাক্ষাৎ বংশধর, এতদিন কোনওরকমে টিকেছিল ওখানে।

গোবিন্দলালকে দেখে কৌতূহল দমন করতে পারলেন না বিনোদবিহারী। বললেন, 'আপনি এখানে যে! আপনারও হার্টের প্রবলেম নাকি?'

গোবিন্দলাল বললেন, 'আমার নয়, মায়ের।'

'আপনার মায়ের!' একটু অবাক হয়ে গেলেন প্রোফেসর বিনোদবিহারী।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোবিন্দলাল যা বললেন তার মর্মার্থ এই যে, তিনি যখন ভোঁদড় ধরতে আফ্রিকায় গিয়েছিলেন তখন তাঁর মা বাড়িতে বসে চিন্তা করে-করে হার্টটাকে ড্যামেজ করে ফেলেছেন। ওই দুর্গম জঙ্গলে ছেলে কী করছে, এই ছিল তাঁর রাতদিনের চিন্তা। গোবিন্দলাল যত তাঁকে বোঝান যে, আফ্রিকার সে জঙ্গল আর নেই, সেখানেও এখন মানুষ বসতি গড়েছে, এমনকী বিদ্যুৎ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। তা কে কার কথা শোনে! দিনরাত শুধু চিন্তা করেছেন ছেলের জন্য।

বিনোদবিহারী বললেন, 'মায়ের মন তো, ছেলেপুলের জন্য আনচান করবেই। যাক! আপনার আসল কাজ তো উদ্ধার হয়ে

গিয়েছে। আমার যে এদিকে কী অবস্থা কী বলব!'

'আপনার তো ভূত?'

'হ্যাঁ,' বিনোদবিহারী হতাশার সঙ্গে বললেন, 'ভূত বোধ হয় ভূ-ভারতে আর একটাও নেই! যে জিনিস নেই, সে জিনিস কেমন করে ধরে আনি বলুন তো? এদিকে মিউজিয়াম অথরিটি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, রোজ তাগাদা দিচ্ছে।'

একটু কী যেন চিন্তা করে গোবিন্দলাল বললেন, 'আছে, ভূত আছে।'

'কোথায়?' খুব ব্যগ্র হয়ে বিনোদবিহারী জিগ্যেস করলেন।

গোবিন্দলাল বললেন, 'আমার মামার বাড়ি বনগাঁর দিকে। কিছুদিন আগে আমার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ও বলল, ওখানে একটা পোড়ো বাড়িতে একদল ভূত এখনও আছে। তবে তারা খুবই ভিতু প্রকৃতির। ভয়টয় দেখানো দূরের কথা, নিজেরাই সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত থাকে। জনসমক্ষে কখনও আসে না। শুধু সুযোগ পেলে মাঝে-মাঝে গৃহস্থের বাড়ি থেকে মাছ ভাজাটাজা চুরি করে নিয়ে যায়। ক'দিন আগেই তো, রান্নাঘরে খুটুর-খুটুর শব্দ শুনে বড় মাসিমা উঁকি দিয়ে দেখেন, কালোমতো কেউ একটা উবু হয়ে বসে মাছভাজা খাচ্ছে। চোর-ছ্যাঁচড় হবে ভেবে বড় মাসিমা 'চোর-চোর' চিৎকার করে উঠলেন। সেই চিৎকার শুনে ভূতটা এত ঘাবড়ে গেল যে, বলার নয়! সোজা বড় মাসিমার পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'আমি চোর নই কর্তামা, ভূত! বিশ্বাস করুন, ভূত! ভ্যানিশ হওয়ার মন্ত্রটা একদম ভুলে গিয়েছি।'

'প্রথমে বড় মাসিমা বিশ্বাস করেননি। তিনি চুলের মুঠি ধরে লোকটাকে টেনে তুলতে গেলেন। আর অমনি কী আশ্চর্য ব্যাপার, মুণ্ডুটা ধড় থেকে খুলে এল বড় মাসিমার হাতে। সে এক সাংঘাতিক দৃশ্য! মুণ্ডহীন ধড়টা জোড় হাত করছে, আর ধড়হীন মুন্ডুটা ভেউভেউ করে কাঁদছে। এবার একটু ভয় পেয়ে গেলেন বড় মাসিমা। মুন্ডুটা ছুড়ে ফেলে দিলেন হাত থেকে। অমনি তাড়াহুড়ো করে সেই ধড় মুন্ডুটা হাতে নিয়েই পাঁইপাঁই ছুট লাগাল।'

সব শুনে বিনোদবিহারী গোবিন্দলালের হাত দুটি চেপে চেপে ধরে বললেন, 'ভাই, প্লিজ! একটু নিয়ে চলুন আপনার মামার বাড়ি। বড় উপকার হয়।'

'সে তো যাওয়া যেতেই পারে,' বিনোদবিহারী ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'তবে চলুন, আজই যাই, দেরি করা ঠিক হবে না।'

একটু চিন্তা করে গোবিন্দলাল বললেন, 'কিন্তু আজ তো ইডেনে ফাইভ-ফাইভ ক্রিকেটের ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল। ইন্ডিয়ার সঙ্গে হন্ডুরাসের খেলা। একটু মাঠে যাব ভেবেছিলাম।'

বিনোদবিহারী চুপ করে গেলেন। এই এফ-ফাইভ ক্রিকেটটাকে তিনি একদম দেখতে পারেন না। এটা খেলা নয়, সার্কাস, শুধু ধুমধাড়াক্কা চালানো। তিনি টি-টোয়িন্টির মতো ধ্রুপদী ক্রিকেটের ভক্ত। কিন্তু এখন টি-টোয়েন্টির বাজার নেই। টি-টোয়েন্টির দেখতে বসলে লোকের নাকি হাই ওঠে।

বিনোদবিহারী বললেন, 'আপনার ম্যাচ শেষ ক'টায়?

'ন'টায়।'

'তা হলে চলুন, তারপর যাই। বনগাঁ আর কতক্ষণ লাগবে? ধর্মতলা থেকে মেট্রো ধরে সোজা বনগাঁ চলে যাব।'

রাতের খাওয়াদাওয়া বেশ ভারী হয়ে গেল বিনোদবিহারীর। গোবিন্দলালের দুশোতিন বছর বয়সি দিদিমা চমৎকার কিছু পদ রান্না করেছিলেন। নারকোল দেওয়া লাউঘণ্ট, ছোলা দেওয়া কুমড়োর ছক্কা, বকফুল ভাজা দিয়ে অনেক ভাত খেয়ে ফেললেন বিনোদবিহারী। সিন্থেটিক ফুড খেয়ে-খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গিয়েছে। এমন সুস্বাদু খাওয়ার বহুদিন খাওয়া হয় না। এদের ছাদের উপর একটা কিচেন গার্ডেন আছে। পালা-পার্বণে কিংবা অতিথি-অভ্যাগত এলে দিদিমা রান্না করেন এসব।

খাওয়াদাওয়ার পর বেরিয়ে পড়লেন দুজন। একটু এগিয়েই দেখা গেল সেই বাড়ি। অবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে, বড়সড় দোতলা বাড়িটা। পলেস্তরা-খসা দেওয়াল। কোথাও ছাদ ভাঙা, কোথাও দেওয়ালে ধস। বহুদিন শরিকি মোকদ্দমা চলেছে বলেই বাড়ি এমন জরাজীর্ণ দশা। সাবধানে ভিতরে ঢুকলেন দুজন। ভিতরে বড়-বড় গাছের জঙ্গল। ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কিছু একটা ডেকে উঠল কোথাও। বিনোদবিহারী জি ডি ডি সিনাল দিতে শুরু করলেন। একটা গাছে ঝুপঝাপ করে নড়ে উঠল কিছু। সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাগ থেকে ম্যাজিক-টর্চটা রে করলেন বিনোদবিহারী। বিশেষ প্রযুক্তিতে তৈরি এই টর্চের আলো এমনই যে, ভূতের চোখে পড়লে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কিছুক্ষণ নড়াচড়া করার

ক্ষমতা থাকে না। সামনের সেই ঝাঁকড়া গাছটায় টর্চের আলো ফেললেন বিনোদবিহারী এবং ভারি অবাক হয়ে গেলে। দুটো বাচ্চা ভূত গাছের ডালে দোল খাচ্ছে। রোগা পিঙপিঙে চেহারা। গায়ে পাটকিলে রঙের বড়-বড় লোম। অনেকটা হনুমানের বাচ্চার মতো দেখতে। শুধু মুখ আর হাত-পায়ের চেটোগুলো সাদা। ম্যাজিক-টর্চের আলো চোখে পড়তেই টুপটুপ করে গাছ থেকে মাটিতে পড়ে গেল ভূত দুটো। বিনোদবিহারী দৌড়ে গেলেন; ব্যাগ থেকে লম্বা একটা কন্টেনার বের করে অ্যান্টি-ভ্যানিশিং-স্প্রে ফসফস করে ছিটিয়ে দিলেন ভূত দুটোর গায়ে। সাতাশরকম জড়িবুটির সঙ্গে ওঝাদের হাঁচি আর কাপালিকের হাই মিশিয়ে, তারপর তার মধ্যে দিয়ে আলফা, বিটা আর গামা রে পাস করিয়ে, তৈরি এই স্প্রে সম্প্রতি উবুন্ডুর এক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন। এর এমনই আশ্চর্য গুণ যে, ভূতের গায়ে স্প্রে করে দিলে তার চব্বিশ ঘণ্টা হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা লোপ পায়।

গোবিন্দলাল চলে এসেছেন কাছে। ব্যাগ থেকে একটা থলে বের করে ভূতে দুটোকে বিনোদবিহারী ভরে ফেললেন তার মধ্যে। গোবিন্দলাল বললেন, 'সাবধান, বাচ্চা ভূত কিন্তু খুব কামড়ায়!'

বিনোদবিহারী বললেন, 'চব্বিশ ঘণ্টা ওরা কিছু করতে পারবে না!'

গোবিন্দলাল বললেন, 'কী বলেছিলাম না আপনাকে, আছে এখানে...।'

গোবিন্দলালের হাত দুটো ঝাঁকিয়ে বিনোদবিহারী বললেন, 'মেনি মেনি থ্যাঙ্কস! আপনার ঋণ কোনও দিনও ভুলব না।'

ঠিক তখন কুঁই-কিক, কুঁই-কিক করে করুণ একটা কান্নার মতো শব্দ শোনা গেল। জি ডি ডি সিগনাল দিতে শুরু করেছে আবার। বিনোদবিহারী তাড়াতাড়ি ম্যাজিক-টর্চের আলো ফেললেন শব্দ অনুসরণ করে। শব্দটা থেমে গেল, কিন্তু কিছু চোখেও পড়ল না। একটু পরে আবার অন্যদিক থেকে এল সেই কান্নার মতো শব্দ। এবারেও ম্যাজিক-টর্চ জ্বেলে কিছু দেখতে পেলেন না বিনোদবিহারী।

গোবিন্দলাল বললেন, 'এটা মনে হচ্ছে মা-ভূতটা। আপনি ঠিক করে ম্যাজিক-টর্চ ফেলে ধরে ফেলুন ওটাকে।'

চুক-চুক করে মুখ দিয়ে আফশোশ সূচক শব্দ করে বিনোদবিহারী বললেন, 'আসলে টর্চের চার্জটা কমে গিয়েছে। চার্জারটাও ভুলে ফেলে এসেছি কলকাতায়। মা-ভূতটা চালাক খুব, আলো ফেললেই চলে যাচ্ছে রেঞ্জের বাইরে।'

গোবিন্দলাল বললেন, 'তা হলে?'

'তা হলে আর কী?' বিনোদবিহারী বললেন 'আমার দুটো ভূত দরকার ছিল, পেয়ে গিয়েছি। কাজ মিটে গিয়েছে আমার। চলুন।'

ঘুম ভেঙে গেল বিনোদবিহারীর। সবেমাত্র ঘুমটা এসেছিল, তখনই সেই 'কুঁই-কিক' কান্নার শব্দ। কে যেন বাড়ির চারদিকে

ঘুরে-ঘুরে কাঁদছে। কাল শুতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল তাঁর। বাড়ি ফেরার পর জনে-জনে থলের মুখ খুলে ভূত দেখাতে হল। বাড়ির বাচ্চারা তো আবার থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে আদরও করে দিল ভূতগুলোকে। গোবিন্দলাল শুয়েছেন দিদিমার কাছে। অনেকদিন পর মামার বাড়ি এসেছেন, তাই দিদিমার কাছে শুয়ে ভূতের গল্প শোনার লোভ সামলাতে পারেন না। একা একটা ঘরে শুয়েছেন বিনোদবিহারী। মুখবন্ধ থলেটা রেখে দিয়েছেন খাটের নীচে। উঠে পড়লেন বিনোদবিহারী। ম্যাজিক-টর্চটা নিয়ে বাইরে এলেন। টর্চের আলো ফেললেন চারিদিকে। আরও কমে গিয়েছে আলোর তেজ। সেই নিস্তেজ আলোয় কিছু দেখতে পেলেন না তিনি।

ঘরে এসে আবার শুয়ে পড়লেন বিনোদবিহারী। ঘুমটা সবে আসব-আসব করছে, আবার সেই করুণ কান্না!

'ধুত্তোর,' বলে উঠে পড়লেন তিনি।

সকালবেলা বিনোদবিহারীকে ঘুম থেকে তুললেন গোবিন্দলাল। বললেন, 'কী করি বলুন তো?' দিদিমা খুব করে বলছেন আজ থেকে যেতে। রাতে মালপোয়া আর পুলিপিঠে করবেন।'

বিনোদবিহারী একটা আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'মালপোয়া! আহা কী খেতে! কতদিন খাইনি! পুলিপিঠেও অবশ্য খারাপ লাগে না!'

মেঝের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন

গোবিন্দলাল, 'এ কী! ভূত কোথায়? বস্তার মুখ যে খোলা!'

বিনোদবিহারী বললেন, 'ছেড়ে দিয়েছি।'

'ছেড়ে দিয়েছেন!' অবাক হয়ে গোবিন্দলাল বললেন, 'কেন ছেড়ে দিলেন কেন? এত কষ্টের জিনিস...!'

একটা হাই তুলে বিনোদবিহারী বললেন, 'ধুর! ঘুমের দফারফা করে দিচ্ছিল। আমার মশাই ঘুম না হলে মাথার ঠিক থাকে না। ঘুম জিনিসটা মালপোয়ার চেয়েও বেশি ভালোবাসি!'

খুব অবাক চোখে বিনোদবিহারীর দিকে তাকিয়ে রইলেন গোবিন্দলাল।

বিনোদবিহারী বললেন, 'কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদলে কি ঘুম হয়? কিন্তু মায়ের জাত যে! ঘ্যানঘ্যান করবেই। করতেই থাকবে। ঘুম, মালপোয়া যেমন ভালোবাসি, কান্না জিনিসটা তেমনই খারাপ বাসি আমি। খু-উ-ব খারাপ বাসি। তাই ছেড়ে দিলাম ব্যাটাদের!

ভাল্লুকনাচ

আমাদের হাম্বিরের মতো আনাড়ি, এলাকা ঢুঁকে ফেললেও দুটো মিলবে না। ও আজ পর্যন্ত কোনওদিন একটিপে কাউকে রান-আউট করতে পারেনি। হাম্বিরের থ্রো মানেই আতঙ্ক। বল উইকেট কিপারের দশ হাত দূর দিয়ে সাঁই করে বেরিয়ে গিয়ে বাই চার হয়ে যাবে। ফুটবল খেলার সময়ও বক্সের মধ্যে থেকে ফাঁকা গোলে বল মেরে গোল করতে পারে না। আমরা ওকে বলি, 'তোর মনে হয় হাড়ের জয়েন্টে গোলমাল আছে। ভালো একজন অর্থোপেডিক সার্জেনকে দেখিয়ে নে।'

তো, এই হাম্বির গত বছর আমাদের পাড়ার স্পোর্টসে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল। হাঁড়িভাঙা ইভেন্টে হাম্বির ফার্স্ট। যেমন-তেমন ফার্স্ট নয়, একেবারে রেকর্ড করে ফার্স্ট। হাঁড়ির ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে একেবারে মাঝখানে মেরে ছরকুটে দিল হাঁড়িটা।

আমাদের স্পোর্টসের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কেউ এভাবে হাঁড়ির মাথায় মারতে পারেনি। কাজটা সহজ নাকি? প্রতিযোগীর চোখ বেঁধে হাঁড়ি থেকে অন্তত চল্লিশ হাত দূরে, বেশ কয়েক পাক ঘুরিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর চোখ বাঁধা অবস্থায় হাঁড়ির কাছে গিয়ে, হাতের লাঠি দিয়ে ভাঙতে হবে হাঁড়িটা। কতজন তো হাঁড়ির ধারেকাছেই যেতে পারে না! একবার

তপতীপিসি বেঁকে একেবারে স্টেজের কাছে চলে গেল। তারপর লাঠি তুলল সভাপতি গোকুলদাদুর মাথার ওপর। গোকুলদাদু স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। বয়স হলেও বেশ চটপটে, তাড়াতাড়ি ধরে ফেললেন পিসিকে। আর-একবার রঘুকাকা মাঠ পেরিয়ে রাস্তা টপকে সজা চলে গেলেন দিনু ময়রার দোকানের সামনে। একটা কুকুর ঘুমোচ্ছিল রাস্তার পাশে। রঘুকাকা ঘুমন্ত কুকুরটাকে দিলেন এক ঘা। কেঁউ-কেঁউ করতে-করতে কুকুরটা ছুটল। এই যখন অবস্থা, তখন হাম্বির মারল হাঁড়ির একেবারে ব্রহ্মতালুতে। চারদিকে হইচই। কয়েকজন তো হাম্বিরকে কাঁধে তুলে নাচানাচি শুরু করল। হাম্বির বাহবা পেল আরও একটা কারণে। সে নাকি প্রবল জ্বর দিয়ে কাণ্ডটা ঘটিয়েছে। ঝুপ্পুস মাংকি ক্যাপ, মাফলার, সোয়েটার পরে মাঠে এসেছিল হাম্বির। হাড়িভাঙা ছাড়া আর কোনও খেলায় নাম দেয়নি।

টাবলু রেগেমেগে বলল, 'কিছু একটা ব্যাপার আছে, না হলে ওর মতো তালকানা...এ অসম্ভব, হতে পারে না!'

টাবলুর রাগের যথেষ্ট কারণ আছে। সে হাঁড়ির মাত্র দু-ইঞ্চি দূরে লাঠি মেরেছিল। সকলে ধরে নিয়েছিল টাবলুই ফার্স্ট। হাম্বির হাসিমুখে গোকুলকাকার হাত থেকে মেডেলটা গলায় পরল। দেখলাম, টুপি, মাফলার সব খুলে ফেলেছে। ওকে দেখে জ্বোরো রুগি বলে মনে হচ্ছে না।

তারপর থেকে হাম্বিরের সে কী ডাঁট! আমাদের দিকে কীরকম করুণার দৃষ্টিতে তাকায়। ভাবখানা যেন শুটিং বা তিরন্দাজিতে অলিম্পিক পদক এনেছে।

কিন্তু কিছুদিন পরেই একটা বোমা ফাটাল ভোলা। সেদিন নাকি স্রেফ জোচ্চুরি করে জিতেছে হাম্বির। ও কানে একটা মোবাইল লাগিয়ে তার উপর বেশ করে মাফলার আর মাংকি ক্যাপ জড়িয়ে নেয়। মাঠের পাশেই ভোলাদের বাড়ি। বাড়ির ছাদ থেকে অন্য একটা মোবাইলে ভোলা নির্দেশ দিচ্ছিল হাম্বিরকে। ভোলার সঙ্গে চুক্তি ছিল, মাঞ্জার ভাগ বলে দেবে হাম্বির। হাম্বিরের এই একটা মস্ত গুণ, ও চমৎকার মাঞ্জা দিতে পারে। ঘুড়ির প্যাঁচে কেউ ওর কাছে দাঁড়াতে পারে না। আমরা অনেকবার জিগ্যেস করেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত ওর মাঞ্জার কারিকুরি কাউকে বলেনি হাম্বির। ভোলাকে কথা দিয়েছিল, বলবে। কিন্তু হাম্বিরের ফর্মুলায় মাঞ্জা তৈরি করে একেবারে ডুবে গেছে ভোলা! একটু ঘুড়িও কাটতে পারেনি। এমনকী, পাশের বাড়ির বোসদের ছোট ছেলেটা পর্যন্ত কচুকাটা করে দিয়েছে ভোলাকে!

সব শুনে আমরা থ। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ঝকঝকে মেডেলটা আলো করে রয়েছে হাম্বিরের আলমারি। টাবলু গিয়ে ধরল হাম্বিরকে, 'কী রে, ভোলা কী সব বলছে?'

হাম্বির উড়িয়ে দিল, 'দুর, দুর! হেরো পার্টিদের এসব অনেক কিছু মনে হবে। তার চেয়ে তোরা এখন থেকে প্র্যাকটিস কর, যদি সামনের বছর কিছু করতে পারিস।'

বাচ্চু গোয়েন্দা গল্পের পোকা। তার ওপর ও একবার একটা বেগুন চোর ধরেছিল ওদের বাড়ির পাশের খেত থেকে। সেই থেকে ওর ধারণা, ও তাবড়-তাবড় গোয়েন্দাদের চেয়ে কিছু কম

নয়। ইদানিং বাচ্চু আবার একটা কুকুর পুষেছে। নেহাতই দিশি কুকুর। তার যত তড়পানি টিকটিকি আর আরশোলা দেখলে। কিন্তু বাচ্চু বলে, ওকে নাকি মারাত্মক সব ট্রেনিং দেওয়া আছে। সুযোগ পেলে চোর, গুণ্ডা, খুনি, বদমাশ সব খুঁজে বের করতে পারে। বাচ্চুর চোখের সামনে এত বড় একটা জালিয়াতি হয়ে গিয়েছে, আর ও টের পায়নি, এটাও কেমন করে মেনে নেবে! বাচ্চু বলল, 'আমার বাঁ কানটা তখনই খুব চুলকোচ্ছিল বুঝলি। বাঁ-কান চুলকোলেই রহস্যের গন্ধ পাই। কিন্তু সেদিন আমার শরীরটা খারাপ ছিল বলে আর মাথা ঘামাইনি।'

তবে এর পর হাম্বিরের হামবড়াই ভাব একটু কমল। আমরাও সুযোগ পেলে ওকে ঠোকা দিই। একদিন ক্লাসের মধ্যে বসে টোপাকুল খাচ্ছিল হাম্বির। ভূগোলস্যার ক্লাসে আসতে তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে ছুড়ে কুলের বিচিটা ফলতে গেল। কিন্তু ওটা সোজা উড়ে গিলে লাগল স্যারে কপালে। কে ছুড়েছে? খোঁজ, খোঁজ! এমন অব্যর্থ টিপ হাম্বির ছাড়া আর কার হবে! ভূগোলস্যার নিল ডাউন করে দিলেন হাম্বিরকে। ক্লাসের শেষে আমরা হাম্বিরকে ধরলাম, 'তোর ওরকম দুর্দান্ত টিপ কোথায় গেল?'

বিশু বলল, 'আসলে হাম্বির চোখ বাঁধা না থাকলে ঠিক টার্গেটে লাগাতে পারে না।'

হাম্বির রেগেমেগে উঠে গেল আমাদের কাছ থেকে।

এ বছর স্পোর্টসের দিন সকাল থেকেই আমরা সবাই খুব হুঁশিয়ার। বেয়াড়া কিছু দেখলেই হাম্বিরকে ধরতে হবে। বাচ্চু ওর কুকুরটাকে চেন বেঁধে এনেছে। বলল, 'হাম্বির চুরি করে একবার

দেখুক না! টমি ঘ্যাঁক করে ধরবে।'

সকাল থেকেই আমাদের শিবতলা মাঠ একেবারে জমজমাট। পাড়ার সকলে মাঠে। শীতকালের চমৎকার রোদ উঠেছে। মাঠের এক কোণে স্টেজ। তাতে হরেক কাপ-মেডেল ঝকঝক করছে। মাঠের ধারে মস্ত বটগাছে দুটো মাইক। গান হচ্ছে, 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে, কত প্রাণ হল বলিদান...'

খেলা শুরু হয়ে গেল। ভেটেরানদের রেসের সময় সে এক কাণ্ড। অবনীজ্যাঠা প্রতিবার নাম দেন এবং সকলের শেষে দৌড়ে শেষ করেন। অবনীজ্যাঠার শরীরটা বিশাল। সেই বিশাল শরীর নিয়ে থপথপ করে দৌড়োন জ্যাঠা। জ্যাঠা কিন্তু প্রত্যেকবার শেষ পর্যন্ত দৌড়োন। কখনও মাঝপথে রেস ছেড়ে আসেন না। ফিনিশিং পয়েন্টে যাঁরা দড়ি ধরে থাকেন, অপেক্ষা করতে-করতে তাঁদের হাত টনটন করে। গতবার আবার মাঝপথে জ্যাঠার জুতোর ফিতে ছিঁড়ে গেল। জ্যাঠা বাড়ি থেকে অন্য একজোড়া জুতো আনার হুকুম দিলেন। সকলে আঁতকে উঠল। সর্বনাশ, ততক্ষণ তা হলে অন্য ইভেন্ট শুরু করা যাবে না। শেষে ভলান্টিয়াররা বিস্তর বুঝিয়ে জ্যাঠাকে নিরস্ত করল। জ্যাঠা ভারি ব্যাজার মুখে এক পাটি জুতো পরে দৌড় শেষ করলেন।

এবার দেখলাম জ্যাঠা কোনও ঝুঁকি নেননি। সঙ্গে অতিরিক্ত একজোড়া জুতো এনেছেন। যদি মাঝপথে ছিঁড়ে যায়, কাজে লাগবে। কিন্তু রেস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চুর কুকুরটা হঠাৎ বিকট ডাক ছেড়ে জ্যাঠার পিছন-পিছন দৌড়োতে শুরু করল। জ্যাঠার কুকুরে ভয়ানক আতঙ্ক। একবার কুকুরের কামড় খেয়ে

পেটে চোদ্দোটা ইনজেকশন নিতে হয়েছিল। তারপর থেকে যে বাড়িতে কুকুর আছে, সেখানে নিমন্ত্রণ পেলেও বয়কট করেন জ্যাঠা। জ্যাঠাও 'ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেললে রে,' বলে মরণপণ দৌড় লাগালেন। সে কী ভীষণ দৌড়! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ওই বিশাল চেহারা নিয়ে জ্যাঠা দৌড়চ্ছেন। চারদিকে ধুলোর ঝড়। ভূমিকম্পের মতো মাটি কাঁপছে। ফিনিশিং পয়েন্টের কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কুকুরটা জ্যাঠাকে টপকে সোজা চলে গেল।

সকলে ধরাধরি করে জ্যাঠাকে তুলল। সারা শরীর ধুলোয় মাখামাখি। মনে হল, ঘটোৎকচ পাউডার মেখে আমাদের শিবতলা মাঠে এসেছে। জ্যাঠা উঠেই চিৎকার শুরু করে দিলেন, 'বাবা রে, কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে রে!'

আমর সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'আপনাকে কামড়ায়নি জ্যাঠামশাই।'

অবনীজ্যাঠা প্রচণ্ড রেগে গেলেন। বললেন, 'বললেই হল কামড়ায়নি! ও এতটা ফালতু ছুটে এল বলতে চাস? না কামড়ালে ওর মজুরি পোষাবে কেন?'

আমরা বললাম, 'ও আপনার পিছনে ছোটেনি। ও ভোলার বিড়ালটাকে তাড়া করেছিল।

বাচ্চুর কুকুর ভোলাদের বাড়ির পাঁচিলের নীচে দাঁড়িয়ে তখনও চিৎকার করছে, আর পাঁচিলের মাথায় বসে খুব নিরাসক্তভাবে গোঁফ চাটছে বেড়ালটা। দেখে, জ্যাঠা কিছুটা শান্ত হলেন। সকলে মিলে ঝেড়েঝুড়ে সাফ করলাম জ্যাঠাকে। আর

তখনই নজরে এল ব্যাপারটা। জ্যাঠা রেসে ফার্স্ট হয়ে গিয়েছেন! বিচারকরা জানালেন যে, অবনীজ্যাঠাই সকলের আগে দড়ি ছুঁয়েছেন। যদিও দড়িটড়ি ছিঁড়ে আছড়ে পড়েছেন, তবুও হিসেবমতো তিনিই ফার্স্ট।

জ্যাঠা তো হাত-পা ছুড়ে নৃত্য শুরু করে দিলেন। কিন্তু অন্য প্রতিযোগীরা প্রতিবাদ করল। তাদের দাবি, কুকুরের তাড়া খেয়ে দৌড় ঠিক বৈধ দৌড়ের মধ্যে পড়ে না।

জ্যাঠা ফুঁসে উঠলেন। দৌড় ইজ দৌড়। তা, সে কুকুর, বাঘ, সিংহ যেই তাড়া করুক না কেন!

বিধুজ্যাঠা ভালো দৌড়োন। প্রতিবছর ফার্স্ট-সেকেন্ড কিছু একটা হন। তখন তিনি বললেন, 'এটা ডোপিং-এর আওতায় পড়ে যাবে। ভয় এক ধরনের উত্তেজনা। সুতরাং, বলা যেতেই পারে উত্তেজকের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল।'

জ্যাঠা বললেন, 'আমি কুকুরের তাড়া খেয়ে দৌড়েছি, প্রমাণ কী?'

'তা হলে ওরকম 'বাবা রে-মা রে' চিৎকার করছিলে কেন?'

'আরে, ওটা এনার্জি আনার জন্য। শ্রমিকরা ভারী কাজ করার সময় কীরকম সব শব্দ করে শোনোনি?'

যাই হোক, বিচারকরা অবনীজ্যাঠাকেই প্রথম ঘোষণা করে দিলেন।

ফার্স্ট হয়ে জ্যাঠার সে কী আনন্দ! আমাকে চুপিচুপি ডেকে পাঁচটা টাকা দিয়ে বললেন, 'বিস্কুট কিনে বাচ্চুর কুকুরটাকে খাইয়ে দিস।'

এই সব কাণ্ডকারখানা ঘটছে, আর আমরা গোয়েন্দার মতো নজরদারি করছি হাম্বিরের ওপর। হাম্বির দেখলাম মেমারি টেস্টে নাম দিয়েছে। আমরা বিট্টুকে ওর পিছনে লাগিয়ে দিলাম। বিট্টুর স্মৃতিশক্তি খুব খারাপ। ইতিহাসে কোনওদিন তিরিশের বেশি পায়নি। ক'দিন আগেই ক্লাসে বাবরের বাবার নাম বলেছে শিবাজি। ওর কাছে লর্ড ক্লাইড আর ক্লাইভ লয়েড একই ব্যক্তি। সকলে জানে বিট্টুর মেমারি টেস্টে কোনও সম্ভবনা নেই। ও নাম দিল শুধু হাম্বিরের পাশে বসে ওর ওপর নজর রাখবে বলে।

মেমারি টেস্টে বিশেষ সুবিধে করতে পারল না হাম্বির। তারপর শুরু হল হাঁড়িভাঙা প্রতিযোগিতা। আরও বেশি সর্তক হয়ে গেলাম আমরা। কিন্তু হাম্বিরের পাত্তা নেই। নেই তো নেই। একেবারে উবে গেছে। মাঠের চারদিকে খুঁজছি আমরা। কিন্তু তার টিকির দেখা নেই। একের পর-এক প্রতিযোগী আসছে, আর ভুলভাল জায়গায় লাঠির ঘা মারছে। এবারেও কেউ হাঁড়ির মাথায় মারতে পারল না। মাইকে বারবার ঘোষণা করা হচ্ছে, গতবারের রেকর্ডধারী চ্যাম্পিয়ান হাম্বিরকে অনুরোধ করা হচ্ছে হাঁড়ি ভাঙার জন্যে।

কিন্তু চ্যাম্পিয়ান বেগতিক দেখে চম্পট দিয়েছে। চিন্ময়টা এরকম বদমাশ, হঠাৎ মাইক্রোফোনটা নিয়ে বলে দিল, 'হাম্বির, তোমার কি এবার জ্বর হয়নি বলে নাম দিতে পারছ না?'

হাঁড়ির ভাঙার পর গো অ্যাজ ইউ লাইক। এটাও খুব জমে উঠল। আমরাও নিশ্চিত। হাম্বির এবার বেশ জব্দ। গো অ্যাজ

ইউ লাইকে কেউ বিবেকানন্দ সেজেছে, কেউ কাগজকুড়ুনি, কেউ ভিখিরি। দামু ডাকাত সেজেছে। ইয়া তাগড়াই গোঁফ, গালে গালপাট্টা, মাথায় লাল ফেট্টি। দামুর সঙ্গে ক'দিন আগেই সুজিতের একচোট ঝামেলা হয়েছে। দামু হঠাৎ সুজিতের চুল ধরে বলল, 'টাকাপয়সা যা আছে চটপট দিয়ে দে।' তারপর সুজিত কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওকে বেশ কয়েক ঘা দিয়ে দিল। সুজিত বুঝতে পারল, দামু শোধ তুলছে। কিন্তু কিছু করার নেই। অভিনয়ের দোহাই দিয়ে পার পেয়ে যাবে দামু।

হঠাৎ একটা মস্ত হইচই উঠল। একটা সবুজ রঙের ভাল্লুক ঢুকেছে মাঠে! পাতাসমেত ছোট-ছোট দেবদারু ডাল বেঁধেছে সারা শরীরে। লম্বা-লম্বা পাতাগুলো লোমের মতো দেখাচ্ছে। ভাল্লুকের সাজ দেখে সকলে একেবারে মোহিত। লম্বা পাতায় মুখ ঢাকা, তার ওপর রংও মেখেছে মুখে। ফলে চেনা যাচ্ছে না ভাল্লুককে। নেচেকুঁদে খেলা দেখাচ্ছে ভাল্লুক। যত ভিড় এখন ভাল্লুককে ঘিরে।

এবার বুঝতে পারলাম, এ বছর ভাল্লুকই হিট। একজন ফলওয়ালা সেজেছিল। ভাল্লুক তার কাছ থেকে একছড়া কলা নিয়ে খেলে লাগল। একজন একটা কলা চাইল। ভল্লুক একটা কলা ছুড়ল তার দিকে। কলাটা দশ হাত দূরে গিয়ে পড়ল। ব্যস! ভাল্লুকটা কে, তখনই ধরে ফেললাম আমরা।

বাচ্চু বলল, 'বুঝেছি, আজ সকালেই কালিদাসী ঠাকুরমা খুব চিৎকার-চেঁচামেচি করছিলেন। ঠাকুরমার দেবদারু পাতা ভেঙে রেখেছিলেন, সব চুরি হয়ে গিয়েছে। এ তা হলে হাম্বিরের কাজ!'

হঠাৎ টাবলু 'দাঁড়াও আসছি,' বলে ছুটে বেরিয়ে গেল মাঠ থেকে। আমরা ভাবলাম, ও ঠাকুমাকে ডেকে আনতে গিয়েছে। একেবারে হাতেনাতে ধরিয়ে দেবে হাম্বিরকে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখি, টাবলু মাঠে ঢুকছে। ওর কাঁধে একটা গামছা, আর সঙ্গে একপাল ছাগল। মাঠে ঢুকেই টাবলু চিৎকার শুরু করল, 'ছাগল কিনবে গো বাবু, ছাগল। ভালো দাম দেব।'

ছাগলওয়ালা টাবলুকে ঘিরে ছোটখাটো ভিড়। টাবলু তার ছাগলের পাল নিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে ভাল্লুকের কাছে চলে এল। ভাল্লুক তখন জ্বরের ভান করে শুয়ে আছে। চোখ বোজা। ছাগলগুলো সামনে ওরকম সবুজ দেবদারু পাতা পেয়ে লাফিয়ে পড়ল। চোখ খুলে ভাল্লুক দ্যাখে তার গায়ের লোক মশমশ করে চিবোচ্ছে একপাল ছাগল। জ্বর ছেড়ে গেল ভাল্লুকের। হাত-পা ছুড়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে সে। কিন্তু ক'টাকে বাধা দেবে! যে ছাগলটা হাঁটু খাচ্ছিল তাকে আড়াল করে তো, অন্য একটা কাঁধ খেতে শুরু করেছে। সেটাকে তাড়াতে না-তাড়াতেই দ্যাখে, আর-একটা তার পেট চিবোচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ন্যাড়া হয়ে গেল ভাল্লুক। হাম্বিরের সারা গায়ে বাঁধা ডালগুলো খোঁচা-খোঁচা হয়ে আছে। ভাল্লুক থেকে শজারু হয়ে গেল হাম্বির। প্রচণ্ড রেগে হাম্বির লাফিয়ে পড়ল টাবলুর ওপর। আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে ছাড়িয়ে দিলাম। হাম্বির দৌড়ে পালাল মাঠ থেকে।

হঠাৎ দেখি, কালিদাসী ঠাকুরমা হন্তদন্ত হয়ে মাঠে আসছেন। এসেই গালমন্দ শুরু করে দিলেন ঠাকমা, 'আমার একটাও ছাগল

নেই। সব বাড়ির পিছনে চরছিল, কোন হতভাগা আমার ছাগল চুরি করেছে র‍্যা?'

টাবলু একগাল হেসে বলল, 'চুরি হবে কেন, এই তো তোমার ছাগল, নিয়ে যাও।'

ছাগলের দড়িগুলো ধরে ঠাকুরমা বললেন, 'বাছারা আমার সকাল থেকে আধপেটা খেয়ে আছে। কাল ওদের জন্য কত দেবদারু পাতা ভেঙে রাখলাম, আজ একটা বলে নেই! এ কী দিনকাল পড়ল গো!'

বাচ্চু বলল, 'চিন্তা নেই ঠাকুরমা, তোমার বাছাদের এখন পেট ভরতি। দেবদারু পাতা ঠিক জায়গাতেই গিয়েছে।'

নতুন নাটকও ভণ্ডুল

'লঘুগুরু নাট্যসমাজ'-এর মিটিং-এ ঠিক হল, গতবারের মতো কেলেঙ্কারি এবার যেন না হয়! আমোদপুরের বিখ্যাত নাটকের দল লঘুগুরু নাট্যসমাজকে বহু দূর-দূরান্তের মানুষ একডাকে চেনে। পাড়ার ছেলেছোকরা থেকে শুরু করে বাবা-কাকা, মায় ইশকুলের অঙ্কস্যার বা বাজারের আমুদে সবজিওয়ালা—সকলেই কোনও না-কোনও সময় স্টেজে উঠেছেন লঘুগুরুর হয়ে নাটক করতে। ফি-বছর দুর্গাপুজোর সময় আমোদপুরে নাটক করে লঘুগুরু। কীসব চমৎকার নাটক আর ফাটাফাটি অভিনয়! সেই নাটক দেখে রাধুচোর সাধু হয়ে গেল, রাগী ইংরাজীস্যার মারধোর ছেড়ে দিলেন। আর সেই কিপটে গোবিন্দকাকা, যিনি কিনা গামছা ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতেন, তিনি বেমক্কা দানধ্যান শুরু করে দিলেন। এরকম আরও অনেক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটছে। সেসব কাহিনি আমোদপুরের মানুষের মুখে-মুখে ঘোরে।

কিন্তু গতবারই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। 'শক্তিগড়ের শার্দুল' নাটক অভিনয় হচ্ছিল। ক্লাবের মাঠে ঠাসাঠাসি ভিড়। সামনের সারিতে এলাকার গণ্যমান্য মানুষজন। দুজন বয়স্কা মহিলা, নন্দীঠাকুরমা আর মিছরিদিদা পান চিবোতে-চিবোতে নাতিদের বজ্জাতির কথা বলছিলেন। সুখময়জ্যাঠা নাকে চশমা এঁটে

ঢুলছিলেন, আর কোনও-কোনও সংলাপ ব্যাকরণমতে অশুদ্ধ, তার নোটস নিচ্ছিলেন বাংলাস্যার রণজয়বাবু।

নাটক তখন প্রায় ক্লাইম্যাক্সে। শক্তিগড়ের রাজা গম্ভীর সিংহের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। তাঁর মন্ত্রী, সেনাপতি নিহত। সৈন্যসামন্ত ছত্রভঙ্গ। তবুও গর্জন করে গম্ভীর সিংহ হুমকিপুরের সেনাপতি তোম্বা শর্মাকে বললেন, 'সিংহ-শেয়ালের রণে, কে জেতে কে হারে। যাইবে পুনঃ দেখা কালিকার মুক্ত রণাঙ্গণে।'

এই সময় তোম্বা শর্মার ছোড়া তির আঘাত করবে গম্ভীর সিংহের বুকে। তোম্বা শর্মার পার্ট করছিল গদাই। গদাইটা চিরকালে আনাড়ি। কোনওদিন এক টিপে উইকেটে বল মেরে রান আউট করতে পারেনি। ঘনশ্যামটা ওকে বারবার বলে দিয়েছিলেন, 'খুব কাছে দাঁড়িয়ে আস্তে করে তিরটা ছুড়ে দিবি।'

কিন্তু গদাই বাহাদুরি দেখানোর জন্য, 'তুই সিংহ, হাসালি আমায়! জেনে রাখ, আজই শেষ দিন তোর। এখনই চোখে লাগবে যে ঘোর,' এসব ফালতু সংলাপ বলে লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে স্টেজের একেবারে কোণে গিয়ে শাঁই করে ছুড়ে দিল তিরটা।

ফল যা হওয়ার তাই হল। তিরটা সোজা গিয়ে লাগল সুখময়জ্যাঠার মাথায়। কাঁচা ঘুম ভেঙে যেতে ভয়ানক চটে গেলেন জ্যাঠা। গনগনে লাল চোখে তাকালেন স্টেজের দিকে। গম্ভীর সিংহের পার্ট করছিল বিজু। সে পড়ে গিয়েছে মহা ফ্যাসাদে। অন্য টার্গেটে আঘাত করা তিরে তার মৃত্যুবরণ করা উচিত হবে কি না, তা বুঝতে পারছে না। অসহায়ভাবে উইংসের দিকে তাকাচ্ছে। আর এদিকে, 'তোরা একটু শান্তিতে ঘুমোতেও

দিবি না,' বলে জ্যাঠা তেড়ে গেলেন বিজুর দিকে।

কাঁদো-কাদোঁ গলায় বিজু বলল, 'আমি নয় জ্যাঠা, গদাই মেরেছে।'

সুখময়জ্যাঠা তখন এক লাফে স্টেজে উঠে গদাইকে ধরতে গেলেন। তারপর দুজনের মধ্যে সে কী ভীষণ দৌড় প্রতিযোগিতা! এই দৃশ্যটা সবচেয়ে বেশি হাততালি পেলেও ভন্ডুল হয়ে গেল নাটকটা।

আমাদের ডিরেক্টর ঘনশ্যাম পোদ্দার দাপুটে মানুষ। তিনি গিরীশ ঘোষের মতো গোঁফ আর শম্ভু মিত্রর মতো দাড়ি রাখেন। এই বছর আমাদের নতুন নাটক, 'লঙ্কাপুরী ওলটপালট।' এবার কাস্টিং-এর সময় ঘনশ্যামদা নতুন একটা কৌশল আমদানি করলেন। আমাদের তারাচরণ বিদ্যাপীঠের হেডস্যারের খুব অভিনয়ের শখ। বেশ লম্বাচওড়া, দশাসই চেহারা তাঁর। গলার স্বরটাও গুরুগম্ভীর। ঘনশ্যামদা তাঁকে পার্ট দিলেন। ক্লাস এইটের অনীতা ঝগড়ুটে স্বভাবের জন্য পাড়ায় বিখ্যাত। ঘনশ্যামদা তাকে মন্থরা করে দিলেন। কিন্তু সমস্যা হল হনুমানকে নিয়ে। কে আর শখ করে কালামুখো হতে চায়! তড়িৎ স্কুলের স্পোর্টসে প্রতি বছর লং জাম্পে ফার্স্ট হয়। ঘনশ্যামদা তাকে ধরলেন।

কিন্তু তড়িৎ কিছুতেই রাজি নয়। বলল, পাগল হয়েছ? রাক্ষসখোক্কস, মুনিঋষি, হরিণ, এমনকী, গরুড়পাখি পর্যন্ত সাজতে রাজি। কিন্তু হনুমান! উঁহু, পাড়ায় প্রেস্টিজের বারোটা বেজে যাবে।'

গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বিস্তর বোঝানোর পর তড়িৎ রাজি

হল বটে, কিন্তু একটা শর্ত দিল। নাটকে হনুমানের কলা খাওয়ার একটা দৃশ্য রাখতে হবে। একছড়া মর্তমান কলা তার চাই।

রিহার্সাল চলল হইহই করে। স্কুল ছুটির পর রিহার্সাল দিই। কিন্তু হেডস্যার খুব কামাই করেন। রাবণ চরিত্রটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে হেডস্যার বললেন, 'ও তোদের ভাবতে হবে না, আমি ঠিক স্টেজে মেকআপ করে নেব।'

অভিনয়ের দিন এসে গেল। দুপুরবেলা তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। এটা ঘনশ্যামদার নির্দেশ। অনেক রাত পর্যন্ত অভিনয় হবে, একটু ফ্রেশ থাকা দরকার।

সন্ধে হতে না-হতেই ক্লাবের মাঠে জমজমাট ভিড়। সুখময়জ্যাঠা যথারীতি সামনের সারিতে। কিন্তু এবার ঘনশ্যামদা কোনও রিস্ক নেননি। প্রথমে ঠিক ছিল, হত্যাটত্যা যা হওয়ার সব ছুরিতে হবে। কিন্তু রামায়ণের যুগে ছুরিকাঘাত খুব বাড়বাড়ি হবে যাবে বলে, প্রস্তাবটা বাতিল হয়ে গিয়েছে। তাই চাঁদমারি বানিয়ে প্রত্যেক তিরন্দাজকে রোজ টানা এক ঘণ্টা করে তির ছোড়া প্র্যাকটিস করিয়েছেন ঘনশ্যামদা।

নবীনকাকা আমাদের বাঁধা মেকআপম্যান কাম ড্রেসার। দু-মিনিটের মধ্যে যে-কোনও মানুষের ভোল বদলে দিতে পারেন। ইদানিং কানে একটু কম শুনছেন। গ্রিনরুমে ঢুকেই নবীনকাকা তড়িৎকে বললেন, 'তোর এমন চমৎকার একখানা লেজ বানিয়েছি না, দেখবি, নাটক শেষ হয়ে গেলেও লেজের মায়ায় আর মানুষ হতে ইচ্ছে করছে না! মনে হবে সারাজীবন হনুমান হয়েই থাকি।'

কিছুক্ষণ পরেই অনীতার সঙ্গে নবীনকাকার লেগে গেল। নবীনকাকা অনীতার পিঠে একটা মাথার বালিশ বেঁধে কুঁজ বানাতে চান। কিন্তু পিঠে বালিশ বাঁধতে অনীতা রাজি নয়। তার দাবি, বালিশ বাঁধার দরকার নেই, একটু কুঁজো হয়ে হাঁটলেই মন্থরার চরিত্র দিব্যি ফুটে উঠবে।

তবে সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারিটা হল মেকআপের শেষের দিকে। টুম্পার মন্দোদরীর পার্ট করার কথা। মেকআপের পর আয়নায় নিজের মুখ দেখেই সে হাউমাউ করে উঠল। আমরা ছুটে গেলাম। টুম্পার সাজ দেখে তো আমাদের চোখ কপালে। এ কী সাজিয়েছেন নবীনকাকা! নবীনকাকা বললেন, 'কেন, চেড়ীর সাজ তো এরকমই হবে!'

টুম্মা কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, 'চেড়ী হব কেন, আমি তো মন্দোদরী!'

নবীনকাকা যত বলেন, 'তুমি আমায় বলেছ অশোকবনের চেড়ী।'

টুম্পা তত হাত-পা ছুড়ে বলে, 'না, আমি বলেছি মন্দোদরী।'

বুঝতে পারলাম, নবীনকাকার কান একেবারেই গেছে। বললাম, 'ঠিক আছে নবীনকাকা, ওকে নতুন করে মন্দোদরীর মেকআপ করে দিন।'

নবীনকাকা হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন, 'আর তো উপায় নেই, রঙের স্টক শেষ। কোনওরকমে চেঁচেপুঁছে টুম্পার মেকআপটা দেওয়া হয়েছে।'

সর্বনাশ! তা হলে উপায়? মন্দোদরী রাবণের স্ত্রী, রাজমহিষী,

তাকে ছাড়া নাটক হবে কী করে? টুম্পা তো ভ্যাক করে কেঁদেই ফেলল।

শেষে ঘনশ্যামদা এসে সমাধান করে দিলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, সাজ যেমন আছে থাক। মন্দোদরীর মুকুটটা ওর মাথায় পরিয়ে দাও। দু-একটা বাড়তি সংলাপ ঢোকাতে হবে। দর্শকদের বুঝিয়ে দিতে হবে, প্রচুর শোকতাপ পেয়েছে তো জীবনে, তাই মন্দোদরীকে এইরকম চেড়ীর মতো দেখতে হয়ে গিয়েছে।'

কালিঝুলি মাখা চেড়ির সাজে সজ্জিত টুম্পাকে ঝলমলে মুকুটটা পরানোর পর যে রূপটা খুলল, তা দেখে আমরা তো বটেই, ঘনশ্যামদা পর্যন্ত চুপ করে গেলেন।

আর সময় নেই, ঢং ঢং করে তৃতীয় ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছে দর্শকরা। নাটক শুরু হয়ে গেল।

প্রথম কয়েকটা দৃশ্য বেশ ভালোভাবে উতরে গেল। সমস্ত দর্শক একেবারে বুঁদ। সীতার দুঃখে কয়েকজন কেঁদেও ফেলল। নন্দীঠাকুরমা আর মিছরিদিদা তো চিৎকার করে মন্থরাকে 'পাজি, শয়তান' বলে গালমন্দ করে বসলেন। আমি বিশ্বামিত্র মুনি সেজেছিলাম। আমার সংলাপে একটা খটমট সংস্কৃত শ্লোক ছিল। সেটার তোড়েই বোধ হয় আমার বাঁ-চোয়াল থেকে দাড়িটা খুলে ঝুলে পড়ল। কিন্তু দর্শকরা বোঝার আগেই, আমি দ্রুত সংলাপ শেষ করে বেরিয়ে এলাম।

আমাদের একটু উদ্বেগ ছিল হেডস্যারকে নিয়ে। কিন্তু তিনিও চমৎকারভাবে উতরে দিলেন। শুধু একবারই একটু বেসামাল হয়ে গিয়েছিলেন। স্যারের দোষ নেই। বয়স্ক মানুষ, রাবণের ওয়ার্কলোড

নিয়ে কিছুটা কাহিল...। গদি আঁটা চেয়ারে বসে একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল স্যারের। দূত এসে সংবাদ দিল, 'মহারাজ, কপিসেনারা লঙ্কাপুরীতে বড় বেয়াদপি করছে।'

স্যার বলে ফেললেন, 'নিল ডাউন হয়ে থাকতে বলো।'

নাটক প্রায় শেষের দিকে। রাম-রাবণের চূড়ান্ত লড়াই। হেডস্যার কষে একটিপ নস্যি নিলেন ঘুম তাড়ানোর জন্য।

গ্রিনরুমে এদিকে আর-এক বিপত্তি। ঘনশ্যামদা ছোট্ট একটা বেলুন জোগাড় করেছিলেন। ঠিক ছিল, আলতাভরা বেলুনটা রাবণের পোশাকের মধ্যে বুকের কাছে লুকোনো থাকবে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর রাম যখন ব্রহ্মাস্ত্র ছুড়ে রাবণকে ঘায়েল করবেন, তখন কায়দা করে চাপ দিয়ে বেলুনটা ফাটিয়ে দেবেন হেডস্যার। লাল হয়ে যাবে রাবণের পোশাক। খুব বিশ্বাসযোগ্য হবে দৃশ্যটা।

কিন্তু আলতা ভারতে গিয়ে দেখা গেল, বেলুনটা লিক করছে। সর্বনাশ! এ তো যা অবস্থা, মৃত্যুবাণ মারার আগেই রাবণের পোশাক লাল হয়ে যাবে। কিন্তু এত রাতে নতুন বেলুনই বা পাওয়া যাবে কোথায়! ভজা দশরথ সেজেছিল। নাটকে তার আর কোনও ভূমিকা নেই। ঘনশ্যামদা তাকে ফিট করে দিলেন। বললেন, 'তুই মগে করে আলতা নিয়ে উইসের পাশে অপেক্ষা কর। বুকে বাণ খেয়ে স্যার যখন স্টেজে আছড়ে পড়বেন, আলতাটা স্যারের গায়ে ছুড়ে দিবি।'

রাম-রাবণের যুদ্ধ শুরু হল। সে কী ভীষণ যুদ্ধ! রামের পার্ট করছে দেবু। ক'দিন আগেই 'লঙ্কাটা ছোট হলেও ঝাল,' এই ট্রানস্লেশনটা পারেনি বলে হেডস্যার তার বাঁ কান ধরে প্রবল

টানাটানি করেছেন। সেই হেডস্যার জনসমক্ষে তার হাতে নিহত হবেন ভেবে সে প্রবল উত্তেজিত। স্যারের মাথায় এক দিকে চারটে, আর-এক দিকে পাঁচটা প্লাস্টিকের মাথা বেঁধে দশটা মাথা তৈরি করা হয়েছে। হাতে তির-ধনুক নিয়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে স্টেজের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ছোটাছুটি করছেন দুজনে। দাপাদাপিতে মচমচ করে উঠছে স্টেজ। মাঝে-মাঝে দুজনে পরস্পরকে হুঙ্কার দিচ্ছেন। নস্যি নিয়ে উজ্জীবিত হেডস্যার ভয়ংকর পরাক্রম দেখাচ্ছেন। হঠাৎ স্যারের মাথার এক পাশ থেকে বাঁধন খুলে পাঁচটা মাথা স্টেজের ওপর পড়ে গেল। আচমকা অর্ধেক মাথা খসে পড়ায় কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়লেন স্যার। ঘনশ্যামদা উইংসের আড়াল থেকে ফিসফিস করে বললেন, 'দেবু, আর দেরি করিস না, বাণ মেরে দে। স্যার, আপনি শুয়ে পড়ুন।'

কিন্তু বাঁধন খুলে মাথা পড়ে গিয়েছে বলে, স্যার মাঝপথেই লড়াই ছেড়ে দিতে রাজি নন। তাঁর এখনও অনেক বিক্রম দেখানো বাকি। স্যারের এক হাতে তির, অন্য হাতে ধনুক। তিরটা ফেলে দিয়ে প্লাস্টিকের মাথাগুলো কুড়িয়ে নিলেন স্টেজ থেকে। তারপর ফের শুরু করলেন যুদ্ধ। বললেন, 'এ মুণ্ড নহে তব শরাঘাতে ছিন্ন মুণ্ড, নেহাত শিথিল রজ্জু হেতু এ মুণ্ড হয়েছে ভুলুণ্ঠিত। তাতে আমি কি ডরাই তোরে ক্ষুদ্র মানব। বরীকুলে যদি জন্ম তব, আইস সম্মুখ সমরে...' ইত্যাদি।

স্যারের হাতে তির নেই, শুধু ধনুক আর প্লাস্টিকের মুন্ডু ঘুরিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। দর্শকরাও বেশ মজা পেয়েছে,

হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করছে রাবণকে।

আগের দৃশ্যেই হনুমান কলা খেয়ে খোসাটা স্টেজের ওপর ফেলেছিল। যুদ্ধ করতে-করতে হঠাৎ সেই খোসায় পা পড়তেই আছাড় খেল রামরূপী দেবু। দেবুর কোমরে একটা পুরোনো চোট ছিল, ক'দিন আগেই ফুটবল খেলতে গিয়ে পেয়েছিল চোটটা। স্টেজের ওপর সশব্দে পড়েই যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল, 'বাবা রে! মরে গেলাম রে...!'

রামকে এভাবে ভূপতিত হতে দেকে স্যার বেশ ঘাবড়ে গিয়েছেন। স্যারের এক হাতে প্লাস্টিকের মাথা, অন্য হাতে ধনুক। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে, 'দশ গুনিব, এর মধ্যে দাঁড়াও উঠিয়া। অস্ত্র লও হাতে!' বলে বক্সিংয়ের রেফারির মতো কাউন্ট ডাউন শুরু করলেন হেডস্যার।

ভজা বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সে দেখল, একজন স্টেজে পড়ে ছটফট করছে। তাড়াহুড়ো করে তার গায়েই ঢেলে দিল আলতাটা। লাল হয়ে উঠল রামের পোশাক।

পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে উঠল। রক্তাক্ত শরীরে রাম স্টেজে শুয়ে ছটফট করছেন, আর সামনে দাঁড়িয়ে বিকট অট্টহাস্য করে কাউন্ট ডাউন করছেন রাবণ, 'ছয়, পাঁচ, চার-র...'

ঘনশ্যামদা দেখলেন, বিপদ। রাবণের হাতে রাম নিহত হলে রণজয়বাবু তাঁকে নির্ঘাত ছাতাপেটা করবেন। তাই তাড়াতাড়ি পরদা টেনে দিলেন।

আমাদের সকলের রাগ গিয়ে পড়ল তড়িতের ওপর। পাজিটা

তখনও হনুমানের পোশাকে গ্রিনরুমের সামনে দাঁড়িয়ে শেষ কলাটা খাচ্ছে। ঘনশ্যামদা তেড়ে গেলেন তার দিকে। বিশাল একটা লাফ দিয়ে মুহূর্তে নাগালের বাইরে চলে গেল তড়িৎ, তারপর দৌড়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

হেডস্যার বললেন।, 'একটা ফিতেটিতে নিয়ে আয় তো, লাফটা মেপে রাখি। এই লাফটা দিতে পারলে ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসে ওর প্রাইজ বাঁধা।'

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন নবীনকাকা, হেসে বললেন, 'শুধু লাফানোর আগে ওই লেজটা লাগিয়ে দেবেন। দেখবেন, ওর ধারেকাছে কেউ আসতে পারছে না। তখন বলেছিলাম না, এই লেজের মাহাত্ম্যই অন্য রকম!'

সাধনবাবর সম্পদ

বড় অভিমান হল ছাতুর। রামনারায়ণ চাটুজ্জের ফলের বাগানে ঢুকেছিল চুপিচুপি। ঘুটঘুট্টি রাত, কেউ কোথাও নেই। এককাঁদি পুরুষ্টু মর্তমান কলা নামিয়ে আনল গাছ থেকে। মনটা ভারি খুশিখুশি। বাঁধের বাজারে নিয়ে গিয়ে কাঁদিটা ফেলতে পারলেই কড়কড়ে সত্তর-আশি টাকা। ক'দিন তা হলে মজা করে বাবুগিরি করা যাবে।

কিন্তু গোলমালটা পাকালেন চাটুজ্জেগিন্নি। তিনি বেজায় ভিতু মানুষ। টিভিতে ভূতের সিরিয়াল দেখে দরজায় বাড়তি তালা লাগান। বাগানে খড়মড় শব্দ শুনেই বাবাগো, মেরে ফেলল গো,...'চোর-চোর, ডাকাত-ডাকাত' চিৎকার। ছাতু দেখল, মহা কেলেঙ্কারি! গোটা বাড়ি জেগে উঠেছে। সে পড়ে গেল দোটানায়। একা পালাবে, নাকি কলার কাঁদিটা নিয়ে...? ভাবতে-ভাবতে খরচা হয়ে গেল কিছুটা সময়। শেষে মর্তমান কলার চেয়ে প্রাণের দাম বেশি সিদ্ধান্ত করে কাঁদি ফেলেই দৌড়োল। কিন্তু চাটুজ্জের নাতি অর্ঘ্য মহা দস্যি ছেলে। রোজ বিকেলে ইশকুল মাঠে দমাদম ফুটবল পেটায়। এক সাঁতারে টপকে যায় মস্ত শিবপুকুর। চোর, ভূত, সাপখোপ, কিছুই তোয়াক্কা করে না।

সে তাড়া করে পঞ্চাননতলায় মোড়ে ধরে ফেলল ছাতুকে। পিছন-পিছন তখন দলবল নিয়ে এসে গিয়েছেন রাম চাটুজ্জে।

তারপর শুরু হাল ছাতুর বিচার। নানা জনের নানা বিধান। কেউ বলল, পুলিশ ডাক। কেউ বলল, বেঁধে রাখ। দু-একজন বলল, গায়ে কাঠপিঁপড়ে ছেড়ে দিলে কেমন হয়? শেষমেশ সবাই সহমত হল, রাম চাটুজ্জের ফলের বাগানটা কুপিয়ে দিতে হবে ছাতুকে।

ভোর থেকে বাগান কোপাতে শুরু করল ছাতু। কোপাতে-কোপাতে ভাবল, এর চেয়ে পুলিশে দিলে অনেক উপকার হত। ছেলেবেলা থেকেই কাজের নামে মাথা ঘোরে, গা বমি-বমি করে ছাতুর। না হলে বিঘে দুয়েক জমি তাদের আছে। বাবা যত দিন পেরেছেন, আবাদ করেছেন। বাবা অক্ষম হতেই পড়ে আছে জমিটা। ছাতু কোনও দিনও জমির ধার মাড়ায়নি। লেখাপড়াও শেখেনি। বার-তিনেক ইশকুলে ভরতি হয়েছিল। শেষবার এক সহপাঠীর কলম আর হেডমাস্টারমশাইয়ের ছাতা চুরি করে সেই যে পালিয়ে এল, আর কোনও দিন ওমুখো হয়নি। এখন ছোটখাটো চুরিচামারিতে ভারি মজায় দিন যাচ্ছে। দিনমানে ফুরফুরে মেজাজে ঘোরে আর সন্ধান রাখে, কার গাছে এঁচড় ধরেছে, কার চালে লাউটা নধর হয়ে এল, কোন ভুলোমন গেরস্ত ঘটি-বাটি তুলতে ভুলে গিয়েছে। নিঝুম রাতে ছাতু তুলে আনে সেগুলো, আর বিক্রি করে দেয় বাজারে। পরিশ্রম নেই, ঝাক্কি নেই। অথচ কী সহজে দু-পয়সা চলে আসে।

কিন্তু এবার ধরা পড়তেই কেলেঙ্কারি। মুখ বুজে মাটি কোপাতে হচ্ছে। কোপাতে-কোপাতে দুপুর। ঘামে ভিজে সপসপ করছে গা। পাড়াসুদ্ধ লোক ঝেঁটিয়ে রগড় দেখে গেল। খবর

পেয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে দৌড়ে এলেন বাবা। শুকনো একখানা কঞ্চি দিয়ে বেশ ঘা কতক দিলেন ছাতুকে। বলে গেলেন, 'আজ থেকে তোকে ত্যাজ্য পুত্তুর করলাম।'

চাটুজ্জেগিন্নি ভিতু বটে, কিন্তু দয়ার শরীর। দুপুরবেলা দুটো রুটি আর এককাপ চা দিয়ে গেলেন ছাতুকে। রাম চাটুজ্জে পাহারা দিচ্ছিলেন গাছতলায় বসে। চা-রুটি খেয়ে ছাতু দেখল, গাছে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন চাটুজ্জেমশাই। নাক ডাকছে ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে। ছাতু আর দেরি করেনি, পাশে খুলে রাখা চাটুজ্জের নতুন চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে পালিয়ে এল চুপিসাড়ে।

তারপর সেই দুপুর থেকে টানা হাঁটছে ছাতু। ঘোর অভিমানে বুকটা যত ভার হচ্ছে, পেটটা খালি হচ্ছে তত। গ্রামের বাইরে এসে একখানা বাসে উঠেছিল। কিন্তু টিকিট কাটতে পারেনি বলে কন্ডাক্টার ঘাড়ধাক্কা দিল মাঝপাথে। ফের হাঁটছে ছাতু। বাড়ি আর ফিরবে না। বড্ড অপমান হল আজ।

সন্ধে নামছে একটু-একটু করে। খিদের চোটে পেটের ভিতর নাড়ি-ভুঁড়িগুলো ভয়ংকর হইচই শুরু করে দিয়েছে। একটা গঞ্জমতো জায়গায় এসে দাঁড়াল ছাতু। বেশ জমজমাটি জায়গা। কিছু দোকানপাট আছে, ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে, কয়েকটা কুকুর অলসভাবে ঘোরাঘুরি করছে আর মাঝে-মাঝে দাঁত বের করে খেয়োখেয়ি করছে। একটা চায়ের দোকানের সামনে বেঞ্চিতে ভয়ে-ভয়ে বসল ছাতু। আজ তার যা বরাত, কুকুরগুলো ভোল পালটে হঠাৎ বাঘ-সিংহ হয়ে না ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর! ভালোমানুষের মতো মুখ করে ঘুগনি,

পাউরুটি আর চা বলল।

খুব ধীরেসুস্থে খাওয়া শেষ করল ছাতু। সঙ্গে একটা কানাকড়িও নেই। কিন্তু আর পালাতে ইচ্ছে করছে না। মাটি কুপিয়ে সারা শরীর ব্যথা, এখন ছোটাছুটি করলে ফের খিদে পেয়ে যাবে। বেশ খানিকটা জল খেয়ে জামার হাতায় মুখ মুছতে-মুছতে দোকানির কাছে কাবুল করল, সমস্যাটা।

শুনে দোকানির কী হম্বিতম্বি। বলল, 'পয়সা নেই তো জামাটা খুলে দে।' কিন্তু জামার হাল দেখে বলল, 'এ তো ন্যাতাও করা যাবে না রে! তার চেয়ে কাপ-ডিশগুলো ধুয়ে দে।'

ছাতু দেখল, কাপ-প্লেট ধোওয়া অনেক আরামের। একটা কাপে কিছুটা চা আর একটা ডিশে এক টুকরো পাউরুটি ছিল, চুপিসাড়ে সেগুলো খেয়ে নিল। আরও একটু বাগে এল খিদেটা। ফলে বেশ মন দিয়ে ধুয়ে কাপ-প্লেটগলো ঝকঝকে করে ফেলল সে। মালিক নন্তুবাবু তো দেখেশুনে বেজায় খুশি। বলল, 'কাজ করবি আমার দোকানে? আমি একটা লোক খুঁজছি।'

ছাতু ভেবে দেখল, মন্দ কী! হালকা-পলকা কাজ। মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে, পেটও চলে যাবে দু-বেলা। সেদিন থেকে কাজে লেগে গেল ছাতু।

দু-চারদিনের মধ্যেই ছাতু বুঝল, এ কাজ বড় ধকলের। শুধু কাপ-ডিশ ধোওয়া নয়, কয়লা ভাঙো রে, জল তোলো রে! দোকান ঘরেই শোওয়ার ব্যবস্থা। তাই খুব ভোরে উঠে আঁচ

দিতে হয়, ঝাঁটপাট দিতে হয় দোকানে। এত মেহনত পোষায় না ছাতুর। কিন্তু উপায়ই বা কী? বাড়ির পথ তো বন্ধ। এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে কে বসিয়ে খাওয়াবে? তাই মুখ বুজে কাজ করে যেতে লাগল ছাতু, আর চোখ-কান খোলা রাখল। কত কিছু নজরে ধরা পড়ল তার। নন্তুবাবুর দোকানে হরেক লোকের মেলা। আজব আজব মানুষ সব। ছাতু ভালোমানুষের মতো মুখ করে চা দেয়, আর চিনেগুনে রাখে সবাইকে। ওই যে, এক কোণে বসে ডিম-টোস্ট আর ঘুঘনি খাচ্ছে, ও যোগলা মস্তান। ওর পকেটে সবসময় ন'ইঞ্চি ফলার চকচকে ছুরি। কত লোকের ধড় থেকে মুণ্ডু ছেঁটে দিয়েছে, নিজেরই হিসেব নেই। ও খাবেদাবে চলে যাবে। দাম চাওয়ার রেওয়াজ নেই ওর কাছ থেকে। ওই যে খবরের কাগজ পড়ছেন মানিকবাবু, গরিব মানুষ, কিন্তু রোজ বিস্কুট কিনে কুকুরদের খাওয়ান। আর শীত-গ্রীষ্মে সব সময় গলায় মাফলার জড়ানো হলধর পাইক, সকাল-সন্ধে আসেন। রেডিয়োর খবরটা শুনে চলে যান। আজ পর্যন্ত একভাঁড় চা-ও খেতে দেখেনি ছাতু।

হঠাৎ একদিন সকালে এক কাণ্ড! টুকুস-টুকুস করে এক বুড়ো এল দোকানে। অমনি ঝাঁক করে বদলে গেল দোকানের হাওয়া। রোগাপাতলা চেহারার মানুষটির মাথায় সাদা চুল, পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া। পরানবাবু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। যোগলামস্তান চট করে লুকিয়ে ফেলল হাতের সিগারেট। চায়ে চিনি কম বলে চিৎকার করছিল বিজন সাহা, হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে একগাল হেসে বলল, 'চিনি কম খাওয়া

অবিশ্যি শরীরের পক্ষে ভালো!'

চুপচাপ দুটো ময়দার বিস্কুট কিনে চলে গেল বুড়োটা। আর ছাতু ভাবতে বসল, বুড়ো না জানি কত বড়লোক! পরানবাবুর মতো পয়সাওয়ালা মানুষ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন, যোগলামস্তান সিগারেট লুকিয়ে ফেলল, গোটা দোকানের বোলচালই বদলে গেল যেন! বাপ রে বাপ, ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্ক ছাতু একটা খদ্দেরের ঘুগনিতে মরিচগুঁড়ো না ছড়িয়ে চায়ে মিশিয়ে গাট্টা খেল নন্তুবাবুর।

রাতে দোকান ফাঁকা হতে নন্তুবাবুকে ছাতু জিগ্যেস করল, 'ওই বুড়োটা কে?'

নন্তুবাবু বললেন, 'কোন বুড়োটা?'

'ওই যে সকালে এল, পরানবাবু পায়ে হাত দিয়ে গড় করলেন। ধুতি-ফতুয়া পরা, রোগামতন, সাদা চুল। বিস্কুট কিনল?'

নন্তুবাবু বললেন, 'আরে, উনি তো সাধনবাবু!'

'সবাই খুব মান্যিগন্যি করে দেখলুম,' ছাতু বলল।

'করবে না?' নন্তুবাবু বললেন, 'কত বড় মানুষ। ওঁরাই তো স্বাধীনতা এনেছেন। সে কী কম কথা!'

স্বাধীনতা শব্দটা ছাতুর শোনা। কিন্তু সম্যক ধারণা নেই। সে বলল, 'স্বাধীনতা মানে? সেটা কি খুব বড়দরের কিছু একটা, মানে...'

নন্তুবাবু বললেন, 'স্বাধীনতা মর্ম বুঝবি তুই, তা হলেই হয়েছে! অতি কষ্টে পেতে হয় এ জিনিস! আর রক্ষা করা আরও

কঠিন!' তারপর তাড়া লাগালেন, 'নে নে, ফালতু কথা থাক, তাড়াতাড়ি ধুয়ে ফেল গেলাসগুলো।'

ব্যস! যা বোঝার বুঝে গেল ছাতু। সাধনবাবু তা হলে একজন মালদার লোক। স্বাধীনতা নামে দামি একখানা জিনিস হস্তগত করেছেন কোনওভাবে। তার জোরেই এত বোলচাল।

রাতে শুয়ে-শুয়ে মতলব ভাঁজল ছাতু, স্বাধীনতাখানা যদি একবার ঝেঁপে দিতে পারে সাধনবাবুর কাছ থেকে, তা হলে একেবারে নিশ্চিন্ত। পায়ের ওপর পা তুলে দিব্যি কেটে যাবে বাকি জীবন।

পরদিন থেকে তলে-তলে খোঁজপাত্তা চালাল ছাতু। বেশ আঁটঘাট বেঁধে নামতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে, সাধনবাবু খুব সেয়ানা। দেখে বোঝার উপায় নেই, এত বড়লোক! ইনি একেবারে তাদের গ্রামের গৌর পালিতের মতো। গৌর পালিত ইয়া বড়লোক, কিন্তু দেখে মনে হবে, হাড়হাভাতে। ইচ্ছে করলে হাতি পুষতে পারেন, কিন্তু নেংটি ইঁদুর পর্যন্ত তাঁর রান্নাঘর থেকে শুধু মুখে ফিরে যায়। ফাঁসা ধুতি আর ডাঁটিভাঙা চশমা পরে দুঃখী-দুঃখী মুখে বাজারের যত পোকাকাটা সবজি আর পচাগলা মাছ কেনেন। কেউ দু-পয়সা ভিক্ষে চাইলে তার হাত জড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে বলেন, 'মাপ কর ভাই। অভাবী মানুষ আমি, কোথা থেকে ভিক্ষে দিই বল!'

ক'দিনের মধ্যেই সাধনবাবুর বাড়িটার আন্দাজ পেয়ে গেল ছাতু। গিয়ে দেখেও এল একদিন। সাদামাঠা বাড়ি, পুরোনো নোনাধরা দেওয়াল, চারদিকে বিস্তর গাছগাছালি। মনে-মনে হাসল

ছাতু। সাধনবাবু গৌর পালিতের চেয়েও এককাঠি সরেস। বাড়িখানার হাল এমন করে রেখেছেন, যাতে লোকের নজর না লাগে। কিন্তু ছাতুও সোজা বান্দা নয়, এসব করে ধোঁকা দেওয়া যাবে না তাকে।

সুযোগ বুঝে একদিন রাতে চুপিচুপি দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল ছাতু। বহুদিনের অনভ্যাস, তাই একটু যেন বুক টিপটিপ করছে, হাঁটু কাঁপছে অল্প-অল্প। আবার ভিতরে-ভিতরে আনন্দও হচ্ছে বেজায়। জিনিসটা একবার বাগাতে পারলেই, বড়লোক। গ্রামে ফিরে যাবে সে। দোতলা কোঠাবাড়ি তুলবে একখানা। লুচি-মাংস খাবে রোজ। আর বিয়ে করবে চাটুজ্জেগিন্নির মতো টুকটুকে একটা মেয়েকে।

ভাবতে-ভাবতে ছাতু দেখল, সাধনবাবুর বাড়ির সামনে চলে এসেছে। পাঁচিলটা খুব বেঁটে। চৌকাঠ ডিঙনোর মতো হেলাফলা করে পাঁচিল টপকাল ছাতু। সন্তর্পণে দেখে নিল চারপাশ। দাওয়ায় একটা টিমটিমে লণ্ঠন, ঝিঁঝি ডাকছে চারদিকে থেকে। ঘরের বন্ধ দরজায় কান পাতল ছাতু। গভীর নিশ্বাসের শব্দ। তার মানে, সাধনবাবু ঘুমিয়ে মাটির তাল। আনন্দে ছাতুর ভিতরটা টুনটুনি পাখির মতন তুড়ুক-তুড়ুক লাফাচ্ছে।

দরজাটা ভালো করে পরখ করতে গিয়ে চমকে উঠল ছাতু। মনে হল, দরজাটা আলগা করে ভেজানো। ভিতর থেকে খিল আঁটা নেই। এবার একটু ঘাবড়ে গেল ছাতু। খিল তুলতে ভুলে গিয়েছে, নাকি নতুন ধরনের ফন্দি এটা? গেরস্ত আজকাল বড় সেয়ানা। লোভ দেখিয়ে চোরকে ভিতরে ঢোকায়, তারপর

ফাঁদে ফেলে।

কাঠ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ছাতু। খুব দোনামোনা লাগছে। একবার ভাবল পালিয়ে যাবে। ফের মনে হল, জিনিসটা একবার হাতাতে পারলেই বড়লোক। সারাজীবনের মতো নিশ্চিন্তি। শ্বাস চেপে দরজাটা একটু ফাঁক করল ছাতু। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে। তক্তাপোশে শুয়ে আছেন সাধনবাবু। ছাতু ভাবল, যা থাকে কপালে! ধীরে-ধীরে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল সে।

ঘরে ঢুকে আরও ঘাবড়ে গেল ছাতু। ঘরে আসবার বলতে মোটে একটা আলনা, ছোট তোরঙ্গ আর জলচৌকি একখানা। আলনায় সামান্য কিছু জামাকাপড়। ভুল বাড়িতে ঢুকে পড়েছে নাকি? চাঁদের আলো তক্তাপোশে শোওয়া মানুষটির মুখে। কাছে গিয়ে ভালো করে নজর করল ছাতু। নাহ, মানুষটি সাধনবাবুই। জিনিসটা মনে হয় তোরঙ্গের মধ্যেই আছে। ধীরে-ধীরে তোরঙ্গ টার সামনে বসল ছাতু। কিন্তু তালা খুঁজতে গিয়ে ফের ধাক্কা, তোরঙ্গে তালা নেই। ছাতু চিন্তায় পড়ল, ব্যাপারখানা কী। লোকটা পাগল না সেয়ানা? যাই হোক, এসে যখন পড়েছে, দেখাই যাক কী আছে বরাতে। তোরঙ্গের ডালাটা তুলে ফেলল ছাতু। ভিতরটা হাতড়াল। বুঝতে পারল, গুচ্ছের বই-পত্তর আর কাগজ। জিনিসটা নিশ্চয়ই একদম তলায় আছে। সাবধানে বইগুলো বের করে আনল ছাতু। কিন্তু কোথায় কী।

তোরঙ্গের তলায় ঠুনঠুন করছে টিকটকির ডিমের মতো ক'টা ন্যাপথলিন।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন জড়িয়ে ধরল তাকে। ছাতু ঝটপট করে ছারাবার চেষ্টা করল। কিন্তু লোকটি বড় মোক্ষম প্যাঁচে ধরেছে। ছাতু বুঝল, ধরা পড়ে গিয়েছে। বলল, 'কথা দিচ্ছি পালাব না। প্যাঁচটা একটু হালকা করলে ভালো হয়, ঘাড়ে বড্ড ব্যথা আমার!'

লোকটি ছেড়ে দিল ছাতুকে। ছাতু ঘুরে দেখল, সাধনবাবু। তা হলে মটকা মেরে পড়ে ছিলেন। ছাতুকে টোপ দিয়ে ধরলেন।

সাধনবাবু বললেন, 'বোসো এইখানে, পালাবার চেষ্টা করবে না কিন্তু!'

ছাতু বলল, 'তা আর বলতে! আপনার গায়ে যখন এত জোর মনে হয় আপনি ছুটতেও পারেন ভালো।'

মেঝেতে বসে পড়ল ছাতু। বাইরের লণ্ঠনটা এনে ঘরে রাখলেন সাধনবাবু। আলোটা একটু উসকে দিলেন। বললেন, 'ঘাড়ে ব্যথা কেন?'

ছাতু বলল, 'কাল একটা কাচের গেলাস ভেঙেছি। নন্তুবাবু রদ্দা মেরেছেন।'

তক্তাপোশে পা তুলে বসলেন সাধনবাবু। বললেন, 'শরীরে চোট নিয়ে তোমার বাপু চুরি করতে বেরনো ঠিক কাজ হয়নি। তারপর তোমার গায়ে জোরও তেমন নেই, একটু চেপে ধরতেই হাঁসফাঁস করে উঠলে!'

ছাতু বলল, 'জোর থাকবে কী করে? নন্তুবাবু যা ভাত দেন,

খাবার পরও পেটে অঢেল জায়গা ফাঁকা থাকে।'

সাধনবাবু বললেন, 'বাড়ি কোথায় তোমার?'

ছাতু একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'বোষ্টমহাটায়।'

সাধনবাবু বললেন, 'তুমি মিছে কথা কইলে। বৈষ্ণবহাটিতে তোমার বাড়ি নয়।'

এবার বেজায় ঘাবড়ে গেল ছাতু। লোকটি ভেলকি জানেন নাকি? মিথ্যে কথাটা ঠিক ধরে ফেললেন। বলল, 'আপনি কি আমাকে পুলিশে দেবেন মনে করেছেন? বলি কী, কেন অত হুজ্জুতিতে যাবেন? এঁটো বাসনটাসন থাকলে বলুন, মেজে দিচ্ছি। ঘরও ঝাঁট দিতে পারি আমি।'

সাধনবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'এত কিছু পারো বলছ, কিন্তু চুরিটাই ভালো করে শিখতে পারোনি। আমার বাড়িতে চুরি করতে ঢোকে কেউ? কী পাবে এখানে?'

'মিছিমিছি কেন লজ্জা দিচ্ছেন?' ছাতু মাথাটাথা চুলকে বলল, 'আমি ভালোমতো খবর নিয়েই এসেছি।'

এবার অবাক হলেন সাধনবাবু, 'কী খবর নিয়েছ?'

'আপনি শুনলুম খুব দামি একখানা জিনিসের মালিক। মিথ্যে বলব না, সেটার সন্ধানেই আসা,' ছাতু বলল।

'আমার কাছে দামি জিনিস।' বিস্মিত সাধনবাবু লণ্ঠনের আলোটা আর-একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এই তো দেখছ ঘরদোরের অবস্থা! দামি জিনিস কোথায় পাবে?'

একটু চুপ করে বসে থাকল ছাতু। মানুষটি বড় গোলমেলে। ভেলকিবাজিটাজি জানেন মনে হয়। তবে খুব মন্দ লোক নন।

এঁকে বলা যেতে পারে আসল ব্যাপারটা।

সাধনবাবু বললেন, 'তোমার বোধ হয় ঠিকানা ভুল হয়েছে, তাই তো?'

ছাতু বলল, 'আপনি সাধনবাবু তো?'

'হ্যাঁ।'

'তবে ঠিকই আছে,' ছাতু বলল। 'আপনার কাছে স্বাধীনতা বলে দামি একখানা জিনিস আছে শুনলাম?'

'স্বাধীনতা বলে দামি জিনিস? কে বলল তোমাকে?' সাধনবাবু খুব অবাক!

'তেমনই তো শুনলুম। আপনি নাকি স্বাধীনতা নিয়ে এসেছেন, তার জোরেই এত মান-সম্মান আপনার? আমি তো নিজের চোখে দেখেছি, সবাই কেমন মান্যি করে আপনাকে।'

হো-হো করে হাসলেন সাধনবাবু। হাসি আর থামতেই চায় না। শেষে কোনও প্রকারে হাসি থামিয়ে বললেন, 'তা পেলে নাকি খুঁজে জিনিসটা?'

ছাতু মাথা নেড়ে বলল, 'তোরঙ্গ ঘেঁটে তো নেই দেখলুম। এখন যদি মেঝেয় কোথাও পোঁতাটোঁতা থাকে।'

'তা শাবল দিচ্ছি একখানা, মেঝে খুঁড়ে দ্যাখো।' সাধনবাবু বললেন, 'কথা দিচ্ছি, খুঁজে পেলে জিনিসটা তোমার।'

ছাতু বলল, 'বুঝেছি। বিশ্বাসী কোনও লোকের কাছে গচ্ছিত রেখেছেন জিনিসটা, ঠিক তো?'

'না, না, আমার কাছেই আছে।' সাধনবাবু বুকে হাত দিয়ে বললেন, 'এই এখানে কোথাও একটা আছে।'

ছাতুর মাথাখানা একদম ভোম্বল। ভাবল, কার পাল্লায় পড়েছে আজ! ইনি পাগল, না পুলিশ, না ব্রহ্মদত্যি? জামা পরে থাকলে না হয় বোঝা যেত বুক-পকেটে আছে। কিন্তু আদুল গায়ে বুকে টোকা মেরে বলছেন, এখানে আছে!

সাধনবাবু বললেন, 'কী হল! খুব অবাক হয়ে গিয়েছ দেখছি!'

ছাতু মাথা নাড়ল, 'ঠিকই!'

'আসলে ব্যাপার কী জানো, এ জিনিস কেউ কাউকে দিতে পারে না। চুরিও করা যায় না। মেহনত করে পেতে হয় জিনিসটা। বুঝলে তো?'

ছাতু অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল। বলল, 'আমি মুখ্যু মানুষ। পরের গোলামি করে খাই। কুকুর-বিড়ালের অধম জীবন। অত কি বুঝতে পারি?'

সাধনবাবু বললেন, 'চেষ্টা করলে ঠিক পারবে। এক সময় আমাদের দেশের মানুষও এমন বিশ্বাস করত, তাই তখন বড় দুর্গতি ছিল তাদের। তবে জিনিসটা যদি একবার পেয়ে যাও, তবে তুমি রাজা। পরের গোলামি করার দরকার হবে না তখন।'

ছাতু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল সাধনবাবুর দিকে।

সাধনবাবু বললেন, 'মনের জোর আনো। তোমার যে শরীরটা আছে, খাটাও। মাথাটা কাজে লাগাও। দেখবে, কখন যেন তুমিই স্বাধীনতা পেয়ে গিয়েছ। তখন আর কাউকে পরোয়া নেই, বুঝতে পারলে?'

ছাতু বলল, 'ঠান্ডা মাথায় আর-একটু কষে ভাবতে হবে। তা

হলে মনে হয় দু-চারদিন পরে বুঝতে পারব। কিন্তু পাবলিকের মারধোর খেলে কি আর ঠান্ডা থাকবে মাথাটা?'

সাধনবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'পাবলিকের মার খাবে কেন খামোকা?'

'এখন আপনি লোক জড়ো করলে তারা তো ছেড়ে কথা কইবে না।'

সাধনবাবু হাসলেন। বললেন, 'বুদ্ধি তোমার মন্দ নেই, সেটাকে শুধু ঠিক পথে কাজে লাগাতে হবে। তুমি এখন যেতে পারো।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ছাতু। বলল, 'ঠিক বলছেন তো! পালাই তা হলে?'

সাধনবাবু বললেন, পালাবার প্রশ্ন আসছে কেন? তুমি তো অন্যায় কিছু করোনি। আমার ঘরে সিঁধ দাওনি, তোরঙ্গের তালা ভাঙোনি, ঘরের দরজা আমার খোলাই থাকে। যে-কেউ যখন খুশি আমার কাছে আসতে পারে।'

ছাতুর মনে হল, মাথাটা ঘুরছে। কী বিপজ্জনক মানুষ রে বাবা! রাতেও ঘরের দরজা বন্ধ করেন না?

খুব আনমনা হয়ে পথে হাঁটছিল ছাতু। আজব মানুষ বটে সাধনবাবু। ধরেও ছেড়ে দিলেন তাকে। ছাতু ফের ভাবল, অন্য মতলব নেই তো মানুষটির? কাল সকালেই হয়তো নন্তুবাবুর কাছে গিয়ে নালিশ করবেন। ওহ্, তা হলে কী হবে? ভাবতেই

পারে না ছাতু। কয়লা ভাঙার হাতুড়ি দিয়ে তার হাত ভাঙবেন নন্তুবাবু।

ভাবতে-ভাবতে নন্তুবাবু দোকানের সামনে এসে পড়ল ছাতু। চিন্তা করল কিছুক্ষণ। লোকটা খুব গোলমেলে। মনে হচ্ছে, কাল নন্তুবাবুর কানে তুলবেন। ছাতু ভাবল, তার কাজ নেই আর এখানে থেকে। অন্য কোথাও আস্তানা গাড়তে হবে।

দোকানের ঝাঁপ তুলে ভিতরে ঢুকল ছাতু। ক্যাশবাক্সে সামান্য কিছু টাকা আছে। টাকাগুলো কাজে লাগবে তার।

কয়লা ভাঙার হাতুড়িটা তুলে নিল ছাতু। তারপর ক্যাশবাক্সের তালায় ঘা মারল হাতুড়ির। হঠাৎ ধপ করে একটা শব্দ হল দোকানের কোণে। বুকটা ঢিপঢিপ করছে। নিশ্বাস চেপে রেখে ভালো করে নজর করল সে। নাহ, তেমন কিছু নয়। সেই পাঁশুটে রঙের বিড়ালটা বোধ হয় ইঁদুর ধরেছে।

ফের হাতুড়ি তুলল ছাতু। হঠাৎ কে যেন চাঁটি মারল মাথায়। ভয়ে পেটটা গুড়গুড় করে উঠল। তাড়াতাড়ি দেশলাই কাঠি জ্বালল। চামচিকে একটা। দোকানময় উড়তে-উড়তে পাক খাচ্ছে।

কাজে আজ কেবল গেরো। মনের মধ্যে হরেক রকম গুলতানি। সাধনবাবু ঘাপটি মেরে বসে আছেন সেখানে। কী যেন সব কথা বললেন, 'স্বাধীনতা চেষ্টা করে পেতে হয়, যে পারে সেই রাজা...!' তবে লোকটার দম আছে! রাতবিরেতে দরজা খোলা রেখে ঘুমোন। ভীতিভয় বলে কিছু নেই!

ছাতু ভাবল, যত জ্বালাতন তার। চারদিকে শুধু ভয়।

নন্তুবাবুকে ভয়, বিড়ালকে ভয়, চামচিকেকে ভয়। মাঝে-মাঝে নিজের ছায়াকেও ভয় করে! আর সাধনবাবুকে দ্যাখো, কেমন দিব্যি দরজা খোলা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। নাহ্, এর একটা হেস্তনেস্ত দরকার।

ফের দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল ছাতু। সাধনবাবু বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। সে বড় মুখ্যু মানুষ। কত কিছু জানে না। কিন্তু সাধনবাবুর পায়ের কাছে বসে কিছু শিখে-পড়ে নেবে।

ভয় কাটাবার পথটা সাধনবাবু বাতলে দিতে পারবেন। সাধনবাবুই পারবেন। ছাতু নিশ্চিত জানে।

ক্রিকেট বনাম ফুটবল

দক্ষিণাচরণ আর বামাপদবাবুর মধ্যে ধুন্ধুমার লেগে গেল। দক্ষিণাচরণ বললেন, 'চার হয়েছে।'

বামাপদবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'উঁহু, সিক্স!'

দক্ষিণাচরণবাবু একটু গলা চড়ালেন, 'ক্রিকেটের কী বুঝিস তুই! চার না ছয় কমেন্ট করার কোনও রাইট তোর নেই।'

বামাপদবাবু বাঁকা হাসলেন, 'খেলাটা বেসিক্যালি ডাংগুলি বই তো নয়। এত বোঝাবুঝির কী আছে!'

'হোল্ড ইয়োর টাঙ। মুখ সামলে কথা বলবি।' দক্ষিণাচরণবাবু বললেন।

'শান্ত হ', কুল ডাইন। উত্তেজিত হোস না, ডোন্ট বি এক্সাইটেড। সত্যি কথাটা মেনে নিতে শেখ।'

'ক্রিকেটের মর্ম বোঝা তোর কর্ম নয়। এ হল রাজার খেলা, খেলার রাজা। এ খেলা বুঝতে গেলে ম্যাজেস্টিক মেজাজ চাই। তোর ওই গাঁইয়া খেলা তো নয়! একটা বল নিয়ে হাফ প্যান্ট পরে একদল লোক করছে। দক্ষিণাচরণবাবু মুখখানা থোম্বা করে ঘুরিয়ে অন্যদিকে নিলেন।

দক্ষিণাচরণ আর বামাপদবাবু সহোদয় ভাই। দক্ষিণাচরণ কালো, লম্বা বামাপদ ফরসা, বেঁটে। দক্ষিণাচরণ তরকারিতে মিষ্টি পছন্দ করেন, আর বামাপদর ঝাল তরকারি ছাড়া মুখে রোচে

না। দক্ষিণাচরণ পছন্দ মতো জিনিস আগে ব্যাগে ঢুকিয়ে তারপর দাম জিগ্যেস করেন, বামাপদ দামদস্তুর করে জিনিস ব্যাগে ঢোকান। উত্তেজিত হলে বড়জোন ইংরেজি বলে তারপর বাংলা তর্জমা করে দেন। ছোট ভাই বাংলাটা বলে, ইংরেজিতে ট্রানস্লেশন করেন।

সবচেয়ে বড় কথা, দক্ষিণাচরণ ক্রিকেট আর বামাপদ ফুটবল।

অর্থাৎ সহোদর ভাই হলেও সব কিছুই উলটো তাঁদের। শুধু জুতোটাই যা দুজনে সোজাসুজি পরেন।

দক্ষিণাচরণের ছেলে ফুটকা আবার ফুটবল। এদিকে বামাপদর ছেলে ব্যাটন অপাদমস্তক ক্রিকেট।

ইডেনে বিশ্বকাপের ফাটাফাটি ফাইনাল ম্যাচ চলছে। জাহির খানের একখানা বল জোর হাঁকিয়েছেন গিলক্রিস্ট। বলটা উড়ে গিয়ে পড়েছে বাউন্ডারির ধারে। কিন্তু দড়ির ভিতরে না বাইরে বোঝা যাচ্ছে না।

আজ সকাল থেকে বাড়িতে বিশ্বকাপ-বিশ্বকাপ হাওয়া। দক্ষিণাচরণ সকাল-সকাল চা খেয়ে বাজারে ছুটলেন। গিয়ে দেখলেন, আলুওয়ালা কেজিতে পঞ্চাশ পয়সা বেশি নিচ্ছে। দক্ষিণাচরণবাবু প্রতিবাদ করলেন।

আলুওয়ালা হেসে বলল, 'দাম তো চড়বেই দাদা, বিশ্বকাপের বাজার! ইন্ডিয়া জিতলে দেখবেন আরও পঞ্চাশ পয়সা বেড়ে গিয়েছে।'

তাড়াহুড়ো করে ফিরছিলেন। মোড়ের মাথায় একটা ছেলে সাইকেল নিয়ে হুড়মুড় করে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। ছেলেটার

নড়া ধরে টেনে তুলে ধমক লাগালেন, 'আস্তে চালাতে পারিস না।'

ছেলেটা হাফাতে-হাফাতে বলল, 'ছেড়ে দিন কাকু, অলরেডি দেড়শো জনের লাইন পড়ে গিয়েছে শুনলাম, আর দেরি হলে ফসকে যাবে।'

'কী ফসকে যাবে?'

'ন্যাড়া মাথায় ট্রাই কালার আঁকব। ইন্ডিয়াকে জেতাতে হবে না!'

'সে তো যারা মাঠে যায় তারা করে!' দক্ষিণাচরণবাবু বেশ চিন্তিত।

এখানে টিভি চ্যানেলের রিপোর্টাররা আসবে। গতবার 'তরুণ দল' ক্লাবের ৯২ জন ন্যাড়া হয়েছিল, টিভিতে ওদের দেখিয়েছিল। এবার আমরা সেঞ্চুরি করবই। প্লিজ, ছেড়ে দিন কাকু, না হলে এবারও তরুণ দল জিতে যাবে।'

হতবাক দক্ষিণাচরণের হাত ছাড়িয়ে ছেলেটা সাইকেল চড়ে বসল। তারপর প্যাডেল মেরেই চিৎকার, 'জিতেগা ভাই জিতেগা, ইন্ডিয়া জিতেগা।'

বামাপদবাবু বেরোলেন লন্ড্রি থেকে জামাকাপড় আনতে। ফেরার পথে ঢুকলেন নান্তুর চায়ের দোকানে। ঘনঘন চায়ের তেষ্টা পায় বামাপদবাবুর। কিন্তু ব্যাটনের মা বলেই দিয়েছেন, 'আজ বেশি চা হবে না। ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে রান্না-খাওয়া সেরে ফেলতে হবে।'

নান্তুর দোকানে বেশ ভিড়, প্রবল গুলগাপ্পা চলছে। কেউ

বলছে দাদাই আজ হিরো। কেউ বলছে, আরে না, না, সচিন। আর-একজন বলল, 'আমি বেট ধরছি, ধোনি। অস্ট্রেলিয়াকে ধুনে ছেড়ে দেবে।'

এক কোণে খবরের কাগজটা পড়ে ছিল। বামাপদবাবু তুলে নিলেন। কাগজটার ল্যাজা থেকে মুড়ো পর্যন্ত শুধু বিশ্বকাপ। অথচ আজ ভারতের সঙ্গে নেপালের ফুটবল ম্যাচ আছে। দ্বাদশ পাতার এক কোণে টিমটিম করছে খবরটা। ভাইচুং ভুটিয়া বেশ আশাভরসা দিয়েছেন। মন দিয়ে পড়ছিলেন, নান্তু চা-টা এগিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করল, 'আর রেজাল্ট কী হবে দাদা?'

বামাপদবাবু বললেন, 'ইন্ডিয়া তিন গোল দেবেই।'

নান্তুর হাত কেঁপে চা চলকে পড়ল বামাপদবাবুর পাঞ্জাবিতে। বামাপদবাবু তখন ফুটবলে বুঁদ। ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

নান্তু নিজের বাঁ-কানটা বামাপদবাবুর দিকে ফিরিয়ে প্রশ্ন করল, 'কী বললেন দাদা?'

'ঠিকই বলছি।' বামাপদবাবু মেজাজে বললেন, 'দেখবি, ভাইচুং হয়তো হ্যাটট্রিক করে ফেলল।'

সভয়ে তিন পা পিছিয়ে গেল নান্তু।

চা খেয়ে রাস্তায় পা দিলেন বামাপদবাবু। দোকানের ভিতর থেকে কে যেন বলল, 'এঃ হেঃ! ট্রিটমেন্ট করার দরকার। এখন কাউকে কামড়েটামড়ে দিলে মুশকিল।'

কে কাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলল, ঠিক বুঝতে পারলেন না বামাপদবাবু।

আজ খাওয়াদাওয়া বেশ তাড়াতাড়ি শান্তিতে মিটে গিয়েছে।

ম্যাচ শুরুর খানিকটা আগে সকলে টিভির সামনে। একটাই টিভি ওদের। ফুটকা-ব্যাটনের ঠাকুরমা হরিমতি বলেছিলেন, 'সময় হলে "নীলাচলে মহাপ্রভু"-টা চালাস বাপু।'

ব্যাটন বলল, 'ঠাকুরমা, আজ আর ওই "দোলাচলে মহাপ্রভু" দেখে কাজ নেই। খেলা দ্যাখো।'

ফুটকা বলল, 'সন্ধেবেলা ফুটবলের সময় ফুটবল দেখবে তো?'

বামাপদ বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

দক্ষিণাচরণ চিৎকার করলেন, 'ইনপসিবল! অসম্ভব! খেলা তখন পিকে উঠবে।'

বামাপদবাবু বললেন, 'ফুটকা, নো চিন্তা। খেলা ততক্ষণে শেষ হয়ে যাবে। দেখবি, পন্টিং কাপ নিয়ে নাচানাচি করছে।'

রবি শাস্ত্রী টিপেটাপে, পিচের ওপর বিস্তর কিল-চড়-ঘুসি মেরে পিচ রির্পোট দিলেন।

দক্ষিণাচরণবাবু বললেন, 'বলছে ঠিক, কিন্তু উলটো হবে দেখবি।'

টসে জিতে ব্যাটিং নিলেন পন্টিং। শুরু থেকেই হেডেন আর গিলক্রিস্ট রে-রে মারতে শুরু করলেন। তারপর তো গিলক্রিস্টের শট নিয়ে লেগে গেল দু-ভাইয়ের মধ্যে।

আম্পায়ার থার্ড আম্পায়ারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। থার্ড আম্পায়ারও দিশেহারা। সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

মিষ্টু ফুটকা-ব্যাটনের পিসির মেয়ে। ক্লাস এইটে পড়ে। মামার বাড়ি এসেছে। সে বলল, 'কেউ যখন ঠিক করতে পারছে না,

পাঁচ রান দিয়ে দিক।'

তর্ক-বিতর্কের মধ্যে আম্পায়ার কখন সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন কেউ খেয়াল করেনি। ফের খেলা শুরু হতে ব্যাটসম্যানরা আর ঝামেলায় গেলেন না। বলগুলো সোজা ফেলতে লাগলেন গ্যালারিতে। আম্পায়ারদের এখন একটাই কাজ, হাত তুলছেন আর নামাছেন।

বামাপদবাবু ফুট কাটলেন, 'আম্পায়ারদের ভালো ব্যায়াম হয়ে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ খেলালে ওঁদের আর ফ্রোজেন সোলডার হবে না।'

কাঁহাতক আর বোলারদের হেনস্তা সহ্য করা যায়। দক্ষিণাচরণবাবু বাইরে যাবেন বলে খাট থেকে নামতে গিয়েছেন, অমনি গিলক্রিস্ট আউট। গ্যালারি নাচছে, জড়াজড়ি করছে ইন্ডিয়ার প্লেয়াররা, পটকার শব্দ আসছে বাইরে থেকে।

ব্যাটনের মা বললেন, 'বি-টিভিটা একবার কর, এখন তো অ্যাড দিচ্ছে। "এক বাতাসের মধ্যে"টা শুরু হয়ে গিয়েছে। ফুটকার মা রিমোটটা নিয়ে বি-টিভি করে দিলেন। কিন্তু সেখানেও অ্যাড!'

ব্যাটন ছিনিয়ে নিল রিমোটটা। চ্যানেল চেঞ্জ করে দিল। পন্টিং ব্যাট ঘোরতে-ঘোরাতে নামছেন। নেমেই হাঁকাতে শুরু করলেন পন্টিং। ফের চার-ছয়ের হরির লুট। ব্যাটন বলেই ফেলল, 'গিলক্রিস্টটা তবুও রয়েসয়ে মারছিল, এ তো পারলে প্রতি বলে দুটো ছক্কা মারে।'

হঠাৎ মিষ্টু বলল, 'বড়মামা, তুমি যখন খাট থেকে অর্ধেক

নেমেছে তখনই আউটটা হল। তুমি আবার অমন করে বসো।'

ব্যাটন বলল, 'হ্যাঁ, জেঠু, তোমার এই পশ্চারটা ইন্ডিয়ার পক্ষে পয়া।'

ফুটকা-ব্যাটনের মায়েরাও বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একবার বসেই দ্যাখো না।'

অগত্যা দক্ষিণাচরণবাবু অর্ধেক ঝুলে রইলেন খাট থেকে।

লাস্ট ওভার শুরু করলেন জাহির খান। হঠাৎ সদর দরজা থেকে আকুতি ভেসে এল, 'দুটো চাল-পয়সা ভিক্ষে দাও মা।'

ব্যাটনের মা বললেন, 'একটু সবুর করো বাছা। ওভারটা শেষ হোক।'

কিন্তু জাহির খানের ওভার আর শেষ হয় না। নো-ওয়াইডে মিলে মোট তেরো খানা বল করে ক্ষান্ত হলেন জাহির। স্কোর বোর্ডে তখন চারশো আশি। ঝুলে থেকে পায়ে ঝিনঝিনে ধরে গিয়েছে দক্ষিণাচরণবাবুর। ব্যাটনের মা বাইরে এসে দেখলেন ভিখিরিটা চলে গিয়েছে। মনটা হায়-হায় করে উঠল।

বামাপদবাবু বললেন, 'তোমার বোলারদের কেরামতি তো দেখাই গেল। দয়া করে এবার ফুটবলটা করো।'

ফুটকা রিমোট টিপে ফুটবল করল। ভারত এক গোলে পিছিয়ে। দক্ষিণাচরণবাবু বললেন, 'তোর বীর যোদ্ধারা নেপালের কাছেও হারছে। কী অবস্থা রে!'

বামাপদবাবু বললেন, 'হারুক জিতুক, এই হচ্ছে খেলা। শরীরের কসরত হয়, ঘাম ঝরে।'

ফুটকা বলল, 'ঠিক বলেছ কাকু, বাঙালির গর্ব ফুটবল।'

'পারবি তোরা কোনওদিন বিশ্বকাপ খেলতে?' দক্ষিণাচরণবাবু প্রশ্ন ছুড়লেন।

'রেখে দাও তোমার বিশ্বকাপ। খেলে তো কুল্লে সাড়ে তেরোখানা দেশ, তার আবার বিশ্বকাপ। নামেই তালপুকুর, ঘটি ডোবে না। গোষ্ঠপালের নাম শুনেছ? একডাকে হোল ওয়ার্ল্ড চেনে। খালি পায়ে এমন ট্যাকল করতেন, বুট জুতো পরা গোরাগুলো ছিটকে পড়ত সাত হাত দূরে। নামই হয়ে গেসল, "চিনের প্রাচীর"।'

বলতে-বলতেই আর-একটা গোল খেল ভারত। ইন্ডিয়ার এক ডিফেন্ডার বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের গোলে ঢুকিয়ে দিল।

একটু বাঁকা হেসে দক্ষিণাচরণবাবু বললেন, 'যাই বলিস, গোলটা কিন্তু চমৎকার করেছে। বল কতটা বাঁক নিল দেখেছিস? রোনাল্ডো, বেকহ্যামরা পারবে কি না সন্দেহ। এই প্লেয়ারটাকে নিশ্চয়ই হোল ওয়ার্ল্ড চেনে। একে কী নামে ডাকে রে সবাই, "বাংলার ছিটেবেড়া"?'

বামাপদ গোমড়া মুখে বললেন, 'সেমসাইড গোল পার্ট অফ দ্য গেম। তোমার ক্রিকেটে রান আউট হয় না, হিট দ্য উইকেট হয় না?'

'নে রে ব্যাটন, চ্যানেল পালটা। ঘরের ছেলেদের দৃষ্টিনন্দন গোল ফের দেখতে পাবি, বিশ্বকাপ ফাইনাল তো রোজ-রোজ হবে না।' দক্ষিণাচরণ তাড়া দিলেন।

আকাশি জার্সি পরে সচিন-সৌরভ মাঠে নামছেন। সচিন

একবার আকাশের দিকে তাকালেন। ক্যামেরা সৌরভকে ফোকাস করল। চোখ পিটপিট করছেন সৌরভ।

'সচিন বলছেন ভগবান আমাকে বাঁচাও। আর সৌরভ চোখে সরষে ফুল দেখছেন।' বামাপদ ফুট কাটলেন।

ম্যাকগ্রার ফার্স্ট ওভারটা দেখেশুনে খেললেন সৌরভ। শেষ বলে একটা চারও মারলেন। দু-চারটে পটকা ফাটল বাইরে। ভুলি কুকুরটা এক পাশে শুয়ে ছিল। ডেকে উঠল ঘেউ-ঘেউ করে। মিষ্টু বলল, 'সৌরভের সেঞ্চুরি আজ বাঁধা।'

পরের ওভারে ব্রেট-লির দুটো বল শাঁইশাঁই করে বেরিয়ে গেল সচিনের কানের পাশ নিয়ে। তার পরই টিভিতে ছবিটা কাঁপতে লাগল, সঙ্গে ডুগডুগ শব্দ।

হাহাকার উঠল, 'সর্বনাশ। টিভি বিগড়ে গেল!'

বামাপদবাবু বললেন, 'টিভি ঠিকই আছে।'

'মানে।'

'মানে আবার কী! সচিন কাঁপছে, তাই ছবিও কাঁপছে। আর শব্দটা সৌরভের হার্ট বিটের শব্দ।'

পরক্ষণেই ছবি চলে এল পরদায়। সচিন চার মেরেছেন। পরের বলে আবার চার। গলার শির ফুলিয়ে চিৎকার করছেন দক্ষিণাচরণবাবু আর ব্যাটন। পরের বলটা শর্ট পিচ। সচিন হুক করলেন। ছয়! আর সামলাতে পারলেন না দক্ষিণাচরণবাবু। লাফ দিয়ে পড়লেন মেঝেয়। নাচতে গিয়ে ভুলির ল্যাজে পা তুলে দিলেন। ঘেউ-ঘেউ করতে-করতে ল্যাজ গুটিয়ে ভুলি ছুটল। কাজের মাসিও বসে গিয়েছে টিভির সামনে। ব্যাটনের মা তাড়া

দিলেন, 'ও মাসি, আর দেরি কোরো না, বাসনগুলো মেজে দাও।'

অনিচ্ছুক মাসি যাওয়ার সময় বলে গেল, 'এই খেলাটা আমার খুব ভালো লাগে। গোল হলে কিন্তু ডেকো বাবু আমাকে।'

পরের ওভারে সচিন আউট। দক্ষিণাচরণবাবু খাটে উঠতে-উঠতে বললেন 'এঃ হেঃ, কী করলি, দেখে চালাবি তো!'

শ্রীশান্ত ব্যাট হাতে নামছেন। এখন শ্রীশান্ত! সকলে একটু বোমকে গিয়েছে। এ হল চ্যাপেলের এক্সপেরিমেন্ট। ব্যাটিং অর্ডার বলে কিছু থাকবে না, বোলিংয়েও তাই। কিছুদিন আগেই একটা ম্যাচে দ্রাবিড় বোলিং ওপেন করেছিলেন। শ্রীশান্ত এলেন আর তিন বল খেলে চলে গেলেন। তারপর হরভজন। তিনি আর-একটু লড়লেন, পাঁচ বল। তারপর স্মার্টলি মাঠে ঢুকলেন দ্রাবিড়। টানা চার ওভার অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল স্রেফ ছেড়ে দিলেন। ছাড়তে-ছাড়তে এমন নেশা জেগে গেল যে, একটা স্টাম্পের বলও ব্যাট উঁচিয়ে ছেড়ে দিলেন। অফ স্টাম্প তিনটে ডিগবাজি খেয়ে উইকেটকিপারের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। একটা বেল দেড়তলা সমান উঁচুতে উঠে পড়ল থার্ড স্লিপের মাথায়।

বামাপদবাবু বললেন, 'ট্রেনের একটা মাছওয়ালা কী বলে জানিস? বলে, 'ইন্ডিয়া টিম আমাদের দাঁতের মতো। একটা পড়লে বাকিগুলো পরপর পড়তেই থাকবে।'

ব্যাটন বলল, 'বুঝেছি। ভুলি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর

থেকেই ইন্ডিয়ার শনির দশা লেগেছে।' ব্যাটন দৌড়ে গেল ভুলিকে ধরে আনতে। কিন্তু ভুলি কিছুতেই ঘরে ঢুকবে না। এখনও তার ল্যাজ দপদপ করছে। ব্যাটন ভুলিকে চাগিয়ে ঘরে ঢুকে জাপটে ধরে বসে থাকল।

৯১ রান করে আউট হলেন সৌরভ। স্কোর ৭ উইকেটে ২৪০ রান। গ্যালারির প্রবল হাততালির মধ্যে মাঠ ছাড়লেন সৌরভ। যাক বাবা, আমাদের সৌরভ বাঘের বাচ্চার মতো বুক চিতিয়ে ফাইট দিয়েছেন। ঘরের ভিড়টা ক্রমশ হালকা হচ্ছে। পাশের রাস্তাটা এতক্ষণ শুনশান ছিল। দু-একটা লোক চলাচল শুরু হয়েছে।

হরিমতী বসে-বসে ঢুলছিলেন। নবম উইকেট পড়তেই মিষ্টু চ্যানেল চেঞ্জ করে নীলাচলে মহাপ্রভু করে দিল। চৈতন্যদেব দু-বাহু ওপর দিকে প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছেন। মিষ্টু হরিমতীকে ধাক্কা দিয়ে ডাকল, 'ও দিদা, টিভি দেখবে তো?'

চটকা ভেঙে হরিমতী বললেন, ' ও বাবা, এ তো মহাপ্রভু। তোরা খেলা দেখিসনি?'

বামাপদবাবু বললেন, খেলাই তো চলছে। ওভার বাউন্ডারি দেখাচ্ছেন তোমার মহাপ্রভু।'

দামু দারোগার দাওয়াই

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কবিতাটা পঞ্চম বার শুরু হতেই অজ্ঞান হয়ে গেল হাঁকু। আগে তিন বার মাঝামাঝি জায়গায় আটকে গিয়েছিল কবিতাটা। চতুর্থবার প্রায় শেষ হওয়ার মুখে খেই হারিয়ে ফেললেন দামু দারোগা। চোখ বুজে কিছুক্ষণ চিন্তা করেও যখন স্মরণে আনতে পারলেন না, ফের শুরু করলেন প্রথম থেকে; আর জ্ঞান হারিয়ে ধপাস করে লক-আপের মেঝেতে পড়ে গেল হাঁকু।

দামু দারোগা আবৃত্তি থামিয়ে কনস্টেবল হারাধনকে ডাকলেন, 'এই এটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে জলের ঝাপটা দে। দিলে ব্যাটা মেজাজটা খিঁচড়ে!' তারপর গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে শুরু করলেন, 'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা...'

তখনই দামু দারোগার পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু, 'এবারের মতো ছেড়ে দিন স্যার; এই নাক-কান মুলছি, লাইন ছেড়ে দিয়ে ভালো ছেলে হয়ে যাব।'

দারোগা প্রকাণ্ড এক দাবড়ানি দিলেন, 'দাঁড়া, সবে তো শুরু, এর পর নজরুলের 'বিদ্রোহী' আছে, সুকান্তর 'ছাড়পত্র' আছে, সুভাষ মুখো...'

লিস্ট শেষ হবার আগেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল

কালু, 'স্যার, যত ইচ্ছা মারুন, কিন্তু আর কবিতা শুনলে পাগল হয়ে যাব।'

মাখনপুর থানায় দামু দারোগা এসেছেন মাত্র ছ'মাস। এর মধ্যেই এখানকার চোর-ছ্যাচোড়দের মধ্যে একটা ত্রাহি রব উঠেছে। মাখনপুরের চোরেদের নাকি জাতই আলাদা। তাবড় তাবড় দারোগাকে তারা পার করে দিয়েছে। কিন্তু তারাই শেষকালে ঠেকে গেল দামু দারোগার কাছে। অথচ খুব সহজ সরল ভালোমানুষের মতো চেহারা দারোগাবাবুর। জালার মতো ভুঁড়ি নেই, ঝুলঝাড়ুর মতো গোঁফ নেই, এমনকী চোখের দৃষ্টিটাও বেশ বৈষ্ণব ধাঁচের। তবে হ্যাঁ, একটা গলা আছে। কী তার তেজ। সেই গলার কাছে মেঘের ডাককেও নিতান্ত মামুলি বলে মনে হয়। অতটুকু শরীর থেকে কী করে অমন গর্জন বেরোয় সেটা খুব বড় রহস্য।

এই দামু কিশোর বয়সে এক দিন বুঝতে পারেন তিনি তুখোড় প্রতিভার অধিকারী। আর পাঁচটা ছেলের মতোই তখন তিনি পাড়ার জলসা বা স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে হাত-পা নেড়ে আবৃত্তি করেন। তো এক দিন এমনই একটা ফাংশানে আবৃত্তি করছিলেন। প্রচুর জনসমাগম হয়েছে। বেশ মুড এসে গেছে দামুর, শ্রোতারাও মগ্ন, হঠাৎ মাইকটা গেল বিগড়ে। দামু না দমে গলার ভলিউমটা শুধু একটু চড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাকি সময়টুকু একজন দর্শকও বুঝতে পারেনি যে মাইক ফেল। অনুষ্ঠানের পর দুজন পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল কিশোর দামুর।

একজন জেলা শহরের বিখ্যাত আবৃত্তিকার বজ্রনাদ রায়, অন্য জন পাবলিকের পিটুনির হাত থেকে বেঁচে যাওয়া মাইকম্যান।

ব্যস, তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি দামুকে। আবৃত্তি হয়ে উঠল তার ধ্যান-জ্ঞান। নাওয়া-খাওয়ার সময় পেতেন না। কবিতার বই, পাঠ্যপুস্তক, পত্রপত্রিকা, লক্ষ্মীর পাঁচালি, মায় বিয়ের কার্ড—কিছুই ছাড়তেন না। ছন্দোবদ্ধ পদ পেলেই হল। গলায় আবেগ এনে পড়ে যেতেন। ধীরে ধীরে বেশ নাম হচ্ছিল দামুর। ডাক-টাকও পাচ্ছিলেন চারদিক থেকে। আর গ্যাদা-গুমোরের বালাই ছিল না তার। ডাক পেলেই চলে যেতেন। রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুল-সন্ধ্যা, সুকান্ত-স্মরণ, বিয়ের বাসর, এমনকী হরিনাম সংকীর্তনের আসরেও আবৃত্তি করার রেকর্ড আছে দামুর। বেশ চলছিল। কিন্তু ঠিক বিখ্যাত হবার মুখে ধাক্কাটা খেলেন দামু। আমাদের পোড়া দেশ! না হলে দামুর মতো প্রতিভাকে পুলিশের চাকরি নিতে হয়! সারাদিন চোর, বদমাশ আর গুন্ডাদের নিয়ে কারবার। একটু দম ফেলবার ফুরসত নেই! চাকরির চক্কোরে দামুর আবৃত্তির পাট উঠে যায় আর কী! প্রথম প্রথম খুব মনমরা হয়ে থাকতেন। কখনও রাগের মাথায় বেশি পিটিয়ে ফেলতেন কয়েদিদের। তারপর হঠাৎ এক দিন খুলে গেল বুদ্ধিটা। দিনের বেলায় যখন সময় পাচ্ছেন না, রাতে চর্চা করলে কেমন হয়! শ্রোতার তো অভাব নেই। লক-আপ ভরতি নানা কিসিমের অপরাধী।

ব্যস, লেগে গেলেন কাজে। রাতে ধরে ধরে আবৃত্তি শোনাতে লাগলেন হাঁকু-বুদো-পঞ্চা-কালুদের। দুজন কনস্টেবল পাহারা দেয়। অন্যমনস্ক হয়ে বা ঘুমের চেষ্টা করলেই রুলের গুঁতো।

দ্বিতীয় দিনই বোঝা গেল আবৃত্তি তেজ। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটা শুরু করেছিলেন দামু। কিন্তু চর্চার অভাবে মরচে পড়ে গেছে স্মৃতিতে। মাঝে মাঝেই খেই হারিয়ে ফেলছেন। ফের শুরু করছেন প্রথম থেকে। এ দিকে বারবার 'ধ্বংস', 'মহাভয়', 'আমি শ্মশান', 'মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা', 'অরুণ খুনের তরুণ' এইসব শুনে ভোর রাতে ভেঙে পড়ল বুদো। ব্যাটা মহা ঘোড়েল। কিছুতেই পেট থেকে কথা বার করা যাচ্ছিল না। সেদিন ঘাবড়ে-টাবড়ে গিয়ে সব কবুল করে ফেলল।

তারপর থেকেই ক্রমশ ত্রাস হয়ে উঠেছেন দামু দারোগা। শব্দ তো নয়, যেন ভারী ওজনের চড়-থাপ্পড় আছড়ে পড়ে কানের ওপর। রোজ পাঁচটা কবিতা। কিন্তু দামুর একটা অদ্ভুত বাতিক আছে। মাঝপথে ভুলে গেলে ফের শুরু করেন প্রথম থেকে। ফলে পাঁচটা কবিতা শেষ হতেই রাত ভোর।

রাত দুটো। একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে মিত্তিরদের পোড়ো বাগান বাড়িটার একটা ঘরে। জোর মিটিং চলছে। এলাকার নামি-দামি সব চোর আছে, আড়কাঠি আছে, এমনকী চোরাই মাল কেনা গণ্যমান্য ব্যক্তিও আছেন কয়েক জন। দারোগা চড়-থাপ্পড়, কিল-ঘুষি যত ইচ্ছা মারুক, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু সারারাত ধরে কবিতার গুঁতো। এ কেমন অত্যেচার!

এক কোণে বসে ছিল ধনা। মাথার চুলগুলো উসকো-খুসকো, মুখ শুকনো, চোখে কেমন পাগল-পাগল দৃষ্টি। সে হঠাৎ হাউমাউ করে ওঠে, 'আমি কালই মাখনপুর ছেড়ে চলে যাব।' বেচারার

আর দোষ কি! কাল সারারাত দামু দারোগা ওকে মেঘনাদবধ কাব্যটা ঝাড়া শুনিয়েছে। সবাই গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয় ধনাকে।

বুদো বলল, 'চল, সবাই মিলে গিয়ে দারোগাবাবুকে বোঝাই যাতে কবিতাগুলো ভালো করে মুখস্থ করে নেয়। তা হলে পাঁচটা কবিতা শেষ হতে রাত কাবার হয়ে যাবে না।'

কালু বলল, 'তার চেয়ে ওপর মহলে কলকাঠি নেড়ে ওর বদলির ব্যবস্থা করাই ভালো।' চোরাই মালের ক্রেতা গণেশবাবু বললেন, ব্যাপারটা মানবাধিকার কমিশনে জানানো যায় কি না তিনি খোঁজ নেবেন।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। মাখনপুরেই বহাল আছেন দামু দারোগা। তা বলে মাখনপুর থেকে চোর-বদমাশের দল লোপাট হয়ে যায়নি। তবে চোরেরা সবে সাক্ষরতা কেন্দ্রে ভরতি হয়ে গেছে। নবসাক্ষর হয়ে তারা মুখস্থ করে নিয়েছে দামুর প্রিয় কবিতাগুলো।

রাতে কাজে বেরোবার আগে প্রস্তুতির সময় তারা গায়ে তেল মাখে, মাথায় চুলগুলো ছোট করে মুড়িয়ে নেয় আর গোপন মন্ত্র-তন্ত্রর সঙ্গে একবার ঝালিয়ে নেয় কবিতাগুলো। লক-আপে দামু দারোগার আটকে গেলে পরের লাইনটা ধরিয়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। পাঁচটা কবিতা শেষ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। কিছুটা হলেও তো রেহাই রে ভাই!

হেলে সর্প দোষ

বিপদভঞ্জন ঠাকুরের কাছে সামনে ডান হাতখানা বাড়িয়ে ভ্যাবলা মুখে বসে আছে হাঁকু। চোখের কোণে কালি, শরীরটা শুকিয়ে আমসি। বেশ কিছুদিন হল তার অবস্থা বেজায় টাইট। দিন দিন বড় সেয়ানা হয়ে উঠছে পাবলিক। চারপাশে পাকা বাড়ি; জানলায় লোহার গ্রিল, দরজায় বোম্বাই সাইজের তালা। হাঁকু তো বাচ্চা ছেলে তার বাপ ঠাকুরদার ঠাকুরদা অবধি ফেল মারত। তার ওপর কোনও বাড়িতে কুকুর, কোনও বাড়িরে রাত-জাগা পড়ুয়া, কোথাও আবার অনিদ্রা রুগি। সারারাত ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে, জল খাচ্ছে আর বাথরুমে যাচ্ছে। এ সব ম্যানেজ করে কোনও প্রকারে চালাচ্ছিল হাঁকু। কিন্তু তার কারবারে লালবাতি জ্বালিয়ে দিল রতন দারোগা। টোকাপুর থানায় নতুন এসেছে রতন। খুব নিরীহ ভালোমানুষের মতো চেহারা; ফিরিওলার মতো অমায়িক ভাবভঙ্গি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এলাকার ত্রাস হয়ে উঠেছে রতন। চোর-বদমাশ ধরা পড়লে সে মারধোরের হাঙ্গামায় বিশেষ যায় না; কিন্তু বদলে যা করে তা আরও ভয়ঙ্কর। এই তো, কিছুদিন আগে একবার ধরা পড়েছিল হাঁকু। রতন দারোগা প্রথমে তাকে পঞ্চাশ গ্রাম মুড়ির সঙ্গে একশো গ্রাম কাঁচালঙ্কা খাওয়াল; তারপর গরম চা। ওহ, বাপরে বাপ! মনে পড়লে এখনও গায়ে কুলকুল করে

ঘাম দেয় হাঁকুর।

এর মধ্যে আশার আলো বলতে এই বিপদভঞ্জন ঠাকুর। কয়েকদিন আগে টোকাপুরে এসেছেন। আস্তানা গেড়েছেন গ্রামের শেষ প্রান্তে করাল-কালী শ্মশানে। শোনা যাচ্ছে ইনি নাকি ত্রিকালসিদ্ধ পুরুষ। হিমালয়ের ওপর পাঁচশো বছর আর গঙ্গার নীচে হাজার বছর একমনে তপস্যা করেছেন। সিদ্ধিলাভের পর সব পাজি গ্রহ-নক্ষত্রকে বশ করে ফেলেছেন উনি। এখন মানুষের হস্তরেখা বিচার করে তাগা মাদুলি আংটি ইত্যাদি দেন। অব্যর্থ সব বিচার আর মোক্ষম সব দাওয়াই; কাজ না হয়ে যায় না। দোগেছের রামরতন ঘোষালের মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল না, আংটি ধারণ করে সৎ-পাত্রস্থ হল; পলাশপুরের ভজহরি গয়লার ছেলেটা কলেজ থেকে পাশটাশ করে বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছিল বহুদিন, মাদুলি ধারণ করে এখন মাদার ডেয়ারির খুব উঁচু পদে বহাল হয়েছে।

এই সব শুনে অনেক আশা নিয়ে হাঁকু এসেছে বিপদভঞ্জন ঠাকুরের কাছে। করাল-কালী শ্মশান দিনের বেলাতেও বেশ ছমছমে জায়গা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বট অশ্বত্থ পাকুর গাছে চারপাশ বেশ অন্ধকার মতো। মোটা মোটা ঝুরি নেমেছে চারপাশে। শ্মশানের পেছন দিকে তিরতিরে সরু নদী, নদীর ওপারে ধূ-ধূ মাঠ। মোটা একটা বটগাছের নীচে ঠাকুরের ঝুপড়ি। ঝুপড়ির সামনে একটা কম্বলের আসনের ওপর বসে আছেন ঠাকুর। ঠাকুরকে দেখলেই ভক্তিতে পেন্নাম ঠুকতে ইচ্ছে করে। রক্তাম্বর জটা-জুট গোঁফ-দাড়ি; তার সঙ্গে কপালে লাল তিলক

আর গলায় রুদ্রক্ষরে মালা—দেখলেই ভেতরটা গুরগুর করে ওঠে। লাল গনগনে চোখ আর বুক হিম করে দেওয়া আগুনে দৃষ্টি। হাঁকু মনে মনে বেশ খুশি—হ্যাঁ ঠিক লোকের কাছেই এসেছে সে। এ পারবে এক মন্তরে রতন দারোগাকে কায়দা করে দিতে।

হাঁকুর হাতখানা নিয়ে অনেকক্ষণ উলটে পালটে টিপেটিপে দেখছেন বিপদভঞ্জন। চোখ দুটো কখনও বড় কখনও ছোট হয়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে ভাঁজ পড়ছে কপালে। ঝোলা থেকে দু-একবার আতশকাচও বের করেছেন; কিন্তু মুখে কোনও কথা নেই। কয়েকবার শুধু 'হুম' 'হাম' শব্দ বেরিয়েছে মাত্র, তারপর ফের কুলুপ পড়ে গেছে মুখে। ঠায় হাত বাড়িয়ে বসে থেকে হাতে ঝিনঝিনে ধরে গেছে হাঁকুর। শেষে মরিয়া হয়ে বলেই ফেলে, কী দেখলেন বাবা?

বিপদভঞ্জন মুখটা একটু গম্ভীর করে বলেন, হুঁ!

আজ্ঞে?

হুম!

ভয়ের চোটে হাতের ঝিনঝিনে মাথায় উঠে এসেছে হাঁকুর। গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনওরকমে মিউমিউ করে জিগ্যেস করে, আজ্ঞে হাতে খারাপ কিছু দেখছেন?

হাঁকুর হাতটা ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকেন বিপদভঞ্জন। তারপর বলেন, হুম, গুরুচণ্ডালী দোষ।

হাঁকুর বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে ওঠে। মাথাটা বাঁই বাঁই করে চক্কর দিচ্ছে; ঢোঁক গিলে সে বলে, সেটা কী জিনিস বাবা?

পার্বতীপুরের মহিম চাটুজ্জের হয়েছিল; তখন তার একেবারে নাজেহাল দশা। গরুর বাঁটে দুধ নেই, খেতের মুনিশগুলো ফাঁকি মারছে আর তেজারতি কারবারে ভয়ঙ্কর মন্দা। স্রেফ তিন রতির একটা রক্তমুখী নীলা দিলুম। ব্যস! এখন গিয়ে দেখে আয় একবার অবস্থাটা।

আতশকাচটা বের করে ফের একবার হাঁকুর হাতটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন বিপদভঞ্জন। মুখটা আরও একটু গম্ভীর হয়, বলেন, হুম, ভৌমদোষও রয়েছে দেখছি।

এবার হাঁকুর মাথাটা ভোঁ ভোঁ করতে থাকে। দরদর করে ঘাম দেয় শরীরে।

বিপদভঞ্জন বলে চলেন, লাহাবাড়ির চিনুর হয়েছিল। বাগানের সব গাছপালা শুকিয়ে কাঠ; চিনুর তো পাগল পাগল দশা। দিলুম একটা মন্ত্রপড়া মাদুলি। ঠিক সাতদিনের মাথায় দোষ কেটে গেল। গাছভরতি তাল নারকোল কখন কার মাথায় পড়ে এই ভয়ে এখন কেউ আর চিনুর বাগানের পাশ দিয়ে হাঁটে না।

হাঁকু মিউমিউ করে বলে, তা ঠাকুর আমাকে কিছু একটা দিন, দোষগুলো চুকেবুকে যাক।

সে তো দেবই; এই জন্যেই তো আমার আবির্ভাব রে ব্যাটা। কিন্তু মায়ের পুজো এনেছিস তো?

আজ্ঞে!

মায়ের পুজো রে ব্যাটা, মায়ের পুজো! মায়ের পুজো ছাড়া এসব শুভ কাজ হয়! দে একশো এক টাকা দে, মায়ের ভোগ চড়াব।

একশো এক টাকা! হাঁকুর চোখ কপালে ওঠে।

বিপদভঞ্জন খেঁকিয়ে ওঠেন, কানে কম শুনিস না কি, কতবার বলব!

হাঁকু এবার ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে,—অত টাকা কোথায় পাব বাবা, বাজার বড্ড মন্দা, রতন দারোগার জ্বালায় তিষ্ঠতে পারছি না। একটু কমজম করো।

ওর কমে হয় না রে, একশো একান্ন টাকা রেট যাচ্ছে এখন; তোর মতো গরিব-গুর্বোদের কিছুটা ডিসকাউন্ট দিই।—বলে ধ্যানস্থ হলেন বিপদভঞ্জন। পাশে বসে নাকি সুরে পিনপিন করে কাঁদতে থাকে হাঁকু।

সূর্যটা পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে। আরও একটু অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে শ্মশানে। কাঁদতে কাঁদতে একটু ঝিমুনি মতো এসে গেসল হাঁকুর। হঠাৎ পেছন থেকে ঠেলা খেয়ে চমকে ওঠে। চেয়ে দেখে ছকু। এ লাইনে তার গুরুদেব। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে ছকুর! পাকিয়ে একেবারে দড়ি হয়ে গেছে। পাঁজরের হাড়গুলো পর্যন্ত গোনা যায়। একসময় ছকুর কাছ থেকে লাইনের অনেক খুটিনাটি শিখেছে হাঁকু। আশপাশের দশ-বিশটা গাঁয়ে সবাই এক ডাকে চেনে ছকুকে। যেমন তুখোড় বুদ্ধি, তেমন মোলায়েম হাতের কাজ। সবচেয়ে বড় কথা সে দিনক্ষণ তিথি সময়ের বাদবিচার করে না। সে ভর দুপুরই হোক বা চাঁদনি রাত—ছকু কাজ সেরে ফেলতে পারে। অনেক হুদো হুদো

দারোগাকে ঘোল খাইয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই ছকুও ঠেকে গেল রতন দারোগার কাছে। মোক্ষম একটা ফাঁদ পেতে রতন ধরেছিল ছকুকে। তারপর রতনের যা নীতি—মারধোরে তো কথাই নেই, একটা দাবড়ানি পর্যন্ত দিল না। চেয়ারে বসিয়ে বাবা বাছা করে অনেকক্ষণ গল্প করল। বউ ছেলেপুলের খবর, গ্রামের চাষবাস, বাজারদর—এইসব আর কি। শেষে তাকে দশটা কাঁচা তেতুল খাইয়ে এক কেজি মটর কড়াই ভাজা খাওয়াল। সেই থেকে ছকুর একেবারে বিচ্ছিরি অবস্থা; শক্ত খাবার দেখলেই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।

সোজা বিপদভঞ্জন ঠাকুরের পা দুটো জড়িয়ে ধরে ছকু, বাবা, দয়া করো বাবা!

কে তুই?

আজ্ঞে, অধমের নাম ছকু।

কী চাইছিস বল?

আজ্ঞে রতন দারোগার মরণ।

চোখ দুটো অর্ধউন্মীতিল করেন বিপদভঞ্জন; মুখে স্মিত হাসি। বলেন, কেমন মরণ চাই—জলে ডোবা না গাড়ি চাপা?

ছকু বলে, জলে কি আর ও জিনিস ডুববে ঠাকুর—ভালো সাঁতার জানে; সেবার তাড়া খেয়ে তো আমি তো ফটিকগাছির বিলে ডুবে বসেছিলুম—রতন দারোগা সাঁতরে আমার চুলের মুটি ধরে তুলে আনল। জলে ও ডুববে না।

জটা, ঝাঁকিয়ে, চোখ বড় বড় করে বিকট একটা অট্টহাস্য করেন বিপদভঞ্জন; ছকু-হাকু দুজনেই চমকে ওঠে। বিপদভঞ্জন

বলেন, তাহলে আর আমি আছি কেন! মন্ত্রের জোরে সব হয়—এমন মন্ত্র ছাড়ব জলে নেমে দারোগার হাত-পা এলিয়ে যাবে। দেখি, তোর হাতটা দে।

বিপদভঞ্জনের পা দুটো ছেড়ে তাড়াতাড়ি হাতটা বাড়িয়ে দেয় ছকু।

হাতটা এক পলক দেখে বিপদভঞ্জন বলেন, হুম।

ছকু বলে, হবে ঠাকুর?

কী?

রতন দারোগার মরণ?

আতশকাচটা ছকুর হাতের ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে বিপদভঞ্জন বলেন, হতে পারে, তবে তোর দোষটা আগে কাটাতে হবে।

ছকু বলে ওঠে, অন্য কাজকাম জানি না, চুরি করে খাই; দোষঘাট তো একটু হবেই ঠাকুর।

দুর সে দোষ নয়, এ হল কাল সর্প দোষ; তোর হাতে দেখতে পাচ্ছি। বড় খতরনাক জিনিস, যাকে ধরবে তার একেবারে সাড়ে-সব্বোনাশ।

ফের বিপদভঞ্জের পা দুটো জড়িয়ে ধরে ছকু; বলে, তুমি আমায় বাঁচাও বাবা, কী দোষ যেন বললে, সেটা কাটিয়ে দাও।

চোখ দুটো বড় করে আবার অট্টহাস্য করেন বিপদভঞ্জন; বলেন, ভয় মৎ কর ব্যাটা, সব বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে। সামনের অমাবস্যায় একটা হোম করব—খুব জাগ্রত হোম। এখন কী করে মারব বল—জলে ডুবিয়ে মারলে তিনশো এক টাকা আর গাড়ি চাপা দিলে চারশো এক টাকা।

হাঁকু জিগ্যেস করে, আজ্ঞে কীসের টাকা?

হোমের খরচ রে ব্যাটা, হোমের খরচ; জলে ডুবে মরলে তাড়াতাড়ি মরবে তাই রেট কম; আর গাড়ি চাপা পড়লে তিন মাস বিছানায় দগ্ধাবে—বলিস যদি ওটা ছ'মাস করে দিতে পারি; তবে পাঁচশো এক টাকা চার্জ লেগে যাবে।

দাঁত কপাটি খেয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল ছকু; নেহাত টোকো দাঁত বলে সামলে নিল। তারপর হাঁউমাঁউ করে বলে উঠল, আমাকে বেচলেও অত টাকা হবে না বাবা, একটু দয়া করো!

বিপদভঞ্জন দাবড়ে ওঠেন, মায়ের সেবায় দরাদরি, তুই তো মহা পাপিষ্ঠ রে! ঠিক আছে, বলছিস যখন হার্ট অ্যাটাক করে দিই! একশো একান্ন টাকা রেট, কিন্তু তিন মিনিটে ফুটে যাবে।

হাতজোড় করে ছকু বলে, তোমার দয়ার শরীর বাবা, রেটটা আর একটু নামে না?

বিপদভঞ্জন খিঁজিয়ে ওঠেন, এ কী মাছের বাজার পেলি না কি—একশো এক টাকা থাকে তো বের কর, না হলে ভাগ এখান থেকে।

ফের ধ্যানস্থ হয়ে পড়েন বিপদভঞ্জন। ছকু তাড়াতাড়ি বিপদভঞ্জনের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকায়। তারপর হাতের ঝোলা ব্যাগটা থেকে একটা কৌটো বের করে। ছোট টিনের কৌটো। বিপদভঞ্জন চোখ পিটপিট করে দেখেন। ছকু বলে, এই নাও বাবা, হোমের খরচ।

বিপদভঞ্জন হাত পাতেন। ছকু কৌটোর মুখটা খুলে তার হাতে উপুর করে দেন। একটা হিলহিলে সাপ বেরিয়ে আসে কৌটো থেকে। বিপদভঞ্জনের হাত থেকে কোলে পড়ে কিলবিল করতে থাকে সাপটা। 'ওরে বাপরে বাপ—সাপ' বলে বিরাট একটা লাফ দিয়ে দৌড়াতে থাকেন বিপদভঞ্জন। সেই সুযোগে পাশে পড়ে থাকা ছোট কাপড়ের থলেটা দিয়ে চম্পট দেয় ছকু। হাঁকু ভ্যাবাচাকা খেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে; তারপর অনুসরণ করে ছকুকে।

শিবু ময়রার দোকানে গরম জিলিপিতে একটা কামড় দিয়ে হাঁকু বলে, জব্বর বুদ্ধি করেছ কিন্তু ছকুদা; এই জন্যই তোমাকে গুরু মানি।

গোটা একটা জিলিপি মুখে পুরে ছকু বলে, ব্যাটা জোচ্চর কোথাকার; লোক ঠকাবার ধান্দা!

হাঁকু বলে, তুমি বুঝলে কী করে সাধুটা নাকলি মাল?

আরে আমার চোখকে ফাঁকি দেবে এমন শম্মা জন্মাতে বাকি। ওটা জটা দাড়ি দেখেই বুঝেছিলাম—এ সব ঝুটো। ক'দিন আগেও একবার এসেছিলুম, তখন কী সব রাহু কেতু শনি ডাউন আছে বলল। সেদিন থেকে তালে ছিলুম, উঠোনে হেলে সাপটা দেখে মতলোবটা মাথায় আসে।

হাঁকু বলে, যাই বল, ঠাকুর জোর ভয় পেয়ে গেছে।

কেমন জোরে ছুটল দেখলি!

ওহ, আমরা যদি তখন ছুটতে পারতুম তা হলে রতন দারোগার হাতে নাকাল হতে হত না।

ফের একটা জিলিপি মুখে পুরে ছকু বলে, ব্যাটা পালানোর কায়দাটা আমাদের শেখাতে পারত, কিছু দক্ষিণা দিতুম; তা নয়, বলে কি না কাল সর্পে দাষ! ওর নিজের কপালে যে হেলে সর্প দোষ নাচছে, সেটা বুঝতে পারেনি। ব্যাটা চোরের হদ্দ।

ছকুর কথা শুনে হো হো করে হেসে ওঠে হাঁকু। তারপর আঙুলে লাগা রসটকু চাটতে চাটতে বলে, যা বলেছ!

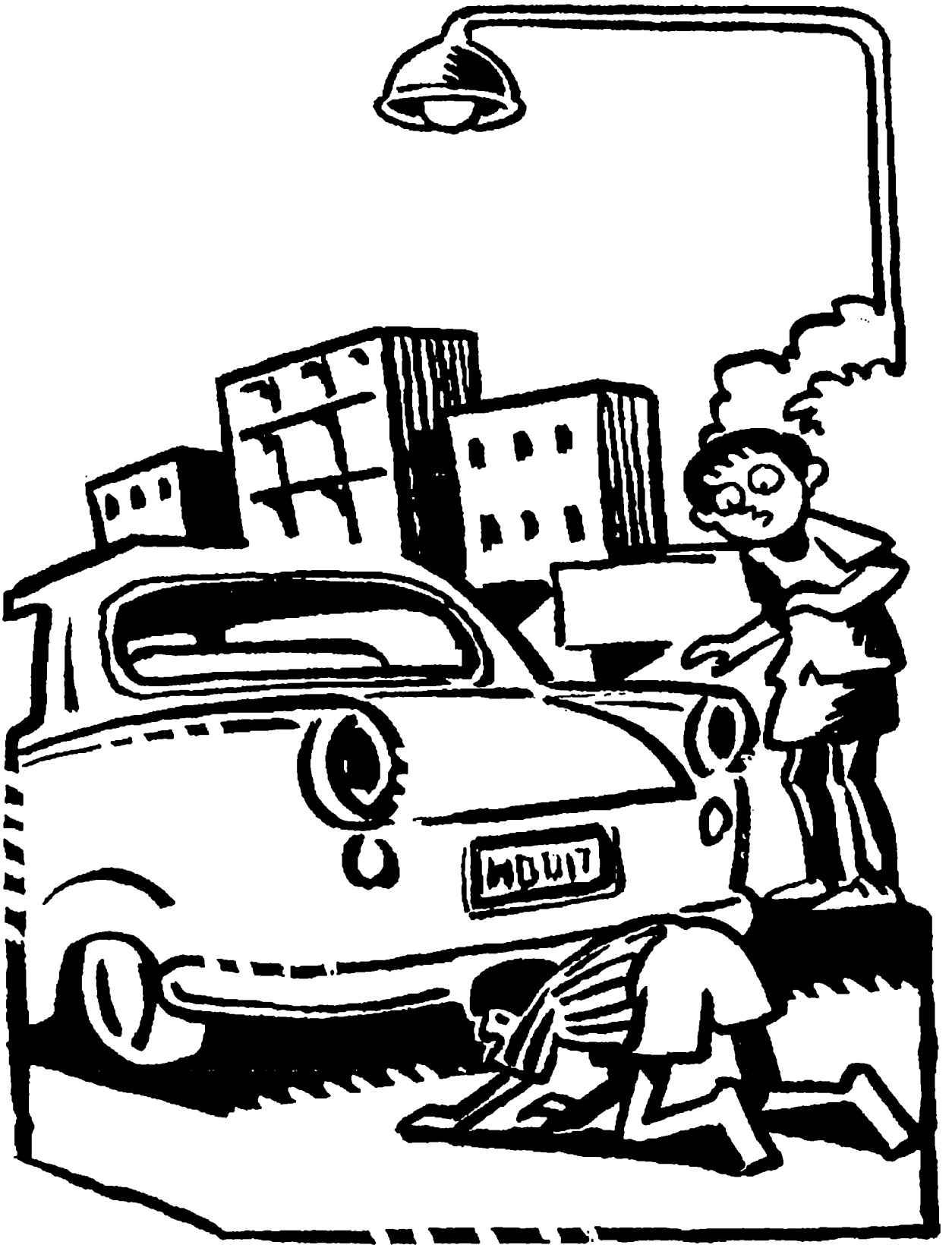

শেষে হাসল হিরু

হিরু গাড্ডায়। গাড্ডা মানে গভীর গাড্ডা।

আজ তিনদিন গৃহবন্দি হিরু। আরও ঠিকঠাক বললে ঘরবন্দি। বাবার হুকুম। একটা ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে তাকে। খাও দাও ঘুমোও আর পড়াশোনা করো। বাইরে যাওয়া একদম নট; ইস্কুল, খেলাধুলো সব বন্ধ।

কুসুমপুর এলাকায় হিরুকে এক ডাকে সবাই চেনে। এমনকী গরু, ছাগল, কুকুর, বাঁদরগুলো পর্যন্ত এড়িয়ে চলে। কীর্তির তো শেষ নেই তার! কারও পাখির খাঁচা খুলে দিচ্ছে, চুপিচুপি কারও রান্নাঘরে ঢুকে তরকারিতে এক খাবলা নুন দিয়ে দিচ্ছে, ভর দুপুরে কোনও বাড়ির ডোরবেল বাজিয়ে দে ছুট। তাই রোজ গণ্ডা গণ্ডা নালিশ হিরুর নামে—ওগো তোমাদের হিরু আমাদের গরুকে কাঁচালঙ্কা খাইয়ে দিয়েছে, ওগো আমাদের খরগোশের লোম চেঁছে দিয়েছে। ফলে বাবার পিটুনি, মায়ের খিঁচুনি, ইস্কুলে নিলডাউন ডেলি রুটিন হয়ে গেছে হিরুর।

হিরু মাঝে মাঝে ভাবে এসব ছেড়ে দিয়ে স্নিগ্ধদীপের মতো গুডবয় হয়ে যাবে। কিন্তু পারেনি। ভালো হয়ে থাকলেই মনে হয় গোটা শরীর চিড়বিড় করে চুলকোচ্ছে, পেটের মধ্যে কী যেন গুড়গুড় করে ডাকছে, ঝিনঝিন করছে হাতপায়ের আঙুলগুলো।

তিনদিন আগে হিরুর বাবা গেলেন ভয়ানক রেগে। সকাল থেকে শুধু নালিশ আর নালিশ। বিন্দুপিসিমার ছাগলটা চরছিল মাঠে; হিরু দিয়েছে তার নাকে নস্যি ঠুঁসে। হেঁচে হেঁচে ছাগল অস্থির, দুধ বন্ধ। ভোলা জ্যাঠামশাই ফিরছিলেন বাজার থেকে। রাস্তার ধারে সাইকেল স্ট্যান্ড করে ঢুকলেন শীতলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে। দই কিনবেন। হিরু যাচ্ছিল পাশ দিয়ে; কী মনে করে সাইকেলের চেনটা ফেলে দিল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল একটু আড়ালে। ভোলা জ্যাঠা দইয়ের হাঁড়িটা পাশে রেখে সাইকেলের চেন তুলছিলেন; সেই ফাঁকে হাঁড়ি নিয়ে হিরু কাট। ভোলা জ্যাঠা নালিশ ঠুকে গেল হিরুর বাবার কাছে।

সেইদিনই আবার ইস্কুল থেকে গার্জেন কল। অরিন্দম রোজ হেভি-হেভি টিফিন আনে। ইয়া বড় বড় মিষ্টি, কোকো দেওয়া কেক, কতরকমের চকলেট। সব খেতে পারে না; তবু দেবেও না কাউকে। সেদিন অরিন্দম টিফিন বাক্সটা খুলে বসেছে, অমনি দেখে একটা হেলে সাপ কিলবিল করছে সামনে। টিফিন ফেলেই অরিন্দম দৌড় দিল।

ভালোমন্দ খাবারগুলো গেল হিরুর পেটে; আর নালিশ গেল হেডস্যারের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে গার্জেন কল।

এর পরই হেডস্যার আর বাবা দুজনে যুক্তি করে গৃহবন্দি করে রেখেছেন হিরুকে।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাছিল হিরু। চোখে একটু করুণ দৃষ্টি। বড় অসহায় লাগছে নিজেকে। কিন্তু কিছু করার নেই। একটু আগে ভোলা জ্যাঠা বাজার থেকে ফিরল। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে

বলল, কী বাপধন একটা কলা খাবে নাকি?

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল হিরু।

জ্যাঠা বলল, বেশ মানিয়েছে, শুধু একটা ল্যাজ থাকলে...

হিরু মনে মনে বলল, দাঁড়াও বেরোতে পাই একবার, তারপর তোমার বাড়িতে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে দেব।

পড়াশোনা এখন বাড়িতেই করতে হবে। বাবা অফিস যাওয়ার আগে কতগুলো অঙ্ক দিয়ে গেছে। ফিরে এসে দেখবে। মা চান করতে ঢুকেছে বাথরুমে। অঙ্কের বইখাতা যেমনকে তেমনই খোলা; একটা আঁচড় পড়েনি তাতে। হঠাৎ হিরুর নজরে পড়ল বাইরে রাস্তার ধারে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখছে। হিরুর চোখে চোখ পড়তে গুটিগুটি এগিয়ে এল সামনে। ছেলেটার মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, কপালে একটা আব, চোখগুলো গোল গোল।

ছেলেটার বলল, কী নাম তোমার?

হিরু। তোমার নাম?

বুম্বা।

তোমাকে তো আগে কোনওদিন দেখিনি আমি। হিরু বলল।

দেখবে কী করে, এটা আমার কাকিমার বাড়ি, আমি এই ফার্স্ট আসছি এখানে। বুম্বা বলল, তা তোমার কী কেস— পরীক্ষায় গাব্বু না কি পাড়ায় উৎপাত?

হিরু বুঝল, এ তার লাইনের ছেলে। বলল, পরীক্ষায় আমি কোনওদিন গাব্বু খাইনি।

তাহলে কী করেছিলে?

তেমন কিছু নয়। হিরু বলল, হেলে সাপ ছেড়ে দিয়েছিলাম একজনের সামনে। তাই তিন দিন হল আমাকে আটকে রেখেছে।

হেলে সাপে তিনদিন! বুম্বা অবাক গলায় বলল, তাহলে কেউটে হলে কী করবে। এ তো দেখছি লঘু পাপে গুরুদণ্ড। সত্যি খুব অন্যায়!

হিরু ব্যথিত মুখে বলল, বড়দের কী সেসব ন্যায়-অন্যায় বোধ আছে ভাই! তা তুমি কি ভাই আমাকে একটু সাহায্য করবে?

কীভাবে? বুম্বা বলল।

হিরু বলল, বাবা অফিসে, মা বাথরুমে; তোমাকে শুধু পাঁচিল টপকে ঢুকে আমার ঘরের শেকলটা খুলে দিতে হবে। পারবে না ভাই পাঁচিলটা টপকাতে?

বুম্বা বলল, শুধু পাঁচিল কেন; বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করতে আমি এভারেস্টও টপকাতে পারি।

২

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল হিরু। আজ তিনদিন পর সে বাইরে বের হল। বুম্বার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে ধন্যবাদ ভাই।

বুম্বা অবাক হয়ে বলল, কেন?

আমাকে উদ্ধার করলে বলে। এত উঁচু পাঁচিল টপকালে।

খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বুম্বা বলল, এ আর এমন কী! এসব

কাজ আমি দিব্যি ঘুমিয়েও করতে পারি।

একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে হিরু তাকাল বুম্বার দিকে। উচুঁ পাঁচিলটা যেমন হেলাফেলার সঙ্গে বুম্বা টপকাল তাতে সে বুঝতে পারছে এ বেশ ওস্তাদ ছেলে।

হিরু বলল, এ ধরনের কাজকর্ম তুমি হামেশাই করে থাকো বুঝি?

বেশ বুক ফুলিয়ে বুম্বা বলল, সে তো বটেই। আরও কতরকম কাজ যে করতে হয়! পাড়ার লোকজন তো আমাকে দেখলে তাড়াতাড়ি দরজা জানলা বন্ধ করে দেয়!

না, এতটা সুনাম এখনও হিরু অর্জন করতে পারেনি। ফলে তার শ্রদ্ধাবোধ বেড়েই যাচ্ছে ক্রমশ। তবু নিজেকে জাহির করার জন্যে বলল, আমাকেও বেশ ভয়ডর করে লোকে; এই তো গেল সপ্তায়-ই আমি দুটো বাড়ির জানলার সার্সি ভেঙেছি ইট ছুড়ে।

বুম্বা তাকাল হিরুর দিকে। তারপর একটু নাক কুঁচকে বলল, ছোঃ! এ তো অতি রদ্দি জিনিস; আদিম প্রস্তর যুগে চলত; তুমি তো ভাই ব্যাক-ডেটেড দেখছি।

একটু দমে গেল হিরু। কথাটা তার আঁতে লেগেছে। তার অমন কীর্তিকে একেবারে নস্যাৎ করে দিল ছেলেটা। তাই সে একটু মরিয়া হয়ে বলল, একবার আমি ইট ছুড়ে একটা ছুটন্ত বাইকের হেডলাইট ফাটিয়ে দিয়েছিলাম।

বুম্বা ঠোঁট উলটে বলল, এটাও তেমন কিন্তু আহামরি নয়। প্রস্তর যুগের না হলেও ব্রিটিশ আমলের বলা যায়। আমাদের

ওখানে বাচ্চারা এসব করে হাত পাকায়।

হিরু বলল, তাহলে তোমাদের ওখানে হালফিল কী চলছে একটা স্যাম্পেল দেখাও।

বুম্বা বেশ ভারিক্কি চালে বলল, দ্যাখো, একটা ইট ছুড়ে একটা হেডলাইট ভেঙেছে তুমি। কিন্তু একটা ইটে একাধিক টার্গেটে হিট করাই আধুনিকতা।

তা আবার হয় না কি! বেশ অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল হিরু।

হয় ভাই, হয়। বেশ গম্ভীর গলায় বুম্বা বলল, মাথা সাফ থাকলে হয়।

বুম্বার দিকে তাকাল হিরু। তার চোখ-মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে বিশ্বাস করেনি কথাটা। হাঁটতে হাঁটতে কালীতলায় মোড়ে চলে এসেছে তারা। মোড়ের মাথায় ঝাঁকড়া আমগাছটার নীচে চার-পাঁচজন লোক জটলা করে দাঁড়িয়ে ঝাগড়া করছে।

বুম্বা বলল, দ্যাখো, কেমন মিছিমিছি ঝগড়া করছে ওরা।

হিরু বলল, তাই তো দেখছি; বড়দের ব্যাপার-স্যাপারই এইরকম।

বুম্বা হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা একটা ঢিল ছুড়ে সবাইকে কাবু করে দিতে পারবে? একটা ঢিল একবারই মাত্র ছুঁড়বে কিন্তু।

মাথা চুলকে কিছুক্ষণ চিন্তা করল হিরু। তারপর কিছুটা হতাশ গলায় বলল, না ভাই, পারব না; এ তো দেখছি অসম্ভব কাজ একটা।

মিটমিট করে হাসল বুম্বা।

হিরু বলল, তুমি পারবে?

ইজিলি। খুব হেলাফেলার সঙ্গে বলল বুম্বা। পায়ের কাছে একটা ইটের টুকরো পড়ে ছিল; তুলে নিল সেটা। তারপর সাঁই করে ছুঁড়ে দিল।

হিরু অবাক হয়ে দেখল লোকগুলোর অনেকটা দূর দিয়ে আমগাছের একটা ডালে আঘাত করলে ঢিলটা। হিরু অবাক হয়ে ভাবল—এ ব্যাটা এত আনাড়ি! লোকগুলো কোথায় আর ঢিলটা গিয়ে লাগল কোথায়! ব্যাটার শুধু বাতেলা। হিরুর মুখে তাচ্ছিল্যের একটা হাসি ফুটে উঠল।

কিন্তু সেই হাসি ভ্যানিশ হয়ে গেল প্রায় পলকে। দেখল, আমগাছের ভেতর থেকে ঝাঁক ঝাঁক বোলতা বের হয়ে ফিরে ধরেছে লোকগুলোকে; আর ঝগড়া ভুলে পড়িমরি দৌড়াচ্ছে তারা।

হিরু অবাক হয়ে তাকাল বুম্বার দিকে।

বুম্বা খুব ভারিক্কি চালে বলল, দেখলে তো! শুধু চোখ কান খোলা রাখতে হবে আর মাথাটা খেলাতে হবে।

শ্রদ্ধায় মাথা ঝুঁকে এল হিরুর। হ্যাঁ, বেশ বুঝতে পারছে সে, এ হল আসল ওস্তাদ। অনেক কিছু শেখার আছে এর কাছ থেকে।

দু-একটা বোলতা ভোঁ-ভোঁ করতে করতে আসছে তাদের দিকে। বুম্বা বলল, চল কেটে পড়ি; বোতলাদের ভালোমন্দ জ্ঞান কম, ওদের না পেয়ে শেষে আমাদেরই হুল দেবে।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল চৌরাস্তার মোড়ে। বেশ জমজমাট জায়গাটা। ইস্কুল ব্যাঙ্ক দোকানপাট মানুষজন সাইকেল

সব মিলিয়ে একটা হইহল্ল ব্যাপার! মোড় থেকে একটু তফাতে একটা পানগুমটিতে বক্স বাজছে গমগমাগম শব্দে। তার সামনেই টুকটুকে লাল একটা মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে। ভারি চকচকে গাড়িটা। দেখেই হাত নিশপিশ করছে হিরুর। এখান থেকে এক টিপে গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়া তার কাছে জলভাত। কিন্তু বুম্বা ঠিক নাক সেঁটকাবে। বলবে, এ আর এমন কী! বস্তাপচা জিনিস— মোঘল আমলের বলা যেতে পারে।

কী ভাবছ, গাড়িটার কাচ ভাঙবে? বলল বুম্বা।

হিরু একটু চমকে গেল। বলল, বাবা, তুমি তো থট রিডার দেখছি!

বুম্বা বলল, তার চেয়ে চলো, গাড়িটায় একটু চাপি।

কী করে?

বুম্বা মিটিমিটি হেসে বলল, মাথা খেলাতে হবে, বুঝলে?

হিরু খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বুম্বার দিকে।

৩

দেখা গেল, বুম্বার কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে হিরু। খোঁড়াতে খোঁড়াতেই গেল গাড়িটার কাছে। গাট্টা-গোট্টা চেহারার ড্রাইভার বসে ছিল সামনে। ওদের দেখেই খেঁকিয়ে উঠল, অ্যাই, কী চাই এখানে?

বুম্বা মুখটা করুণ করে বলল, কাকু আমার বন্ধুর খুব অসুখ।

তাতে আমি কী করব?

ও একদম হাঁটতে পারছে না। বুম্বা বলল, ওকে একটু ডাক্তারখানায় পৌঁছে দেবেন?

এবার ড্রাইভার দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এল—ভাগ এখান থেকে, ভাগ বলছি, না হলে থাবড়া মেরে...।

ড্রাইভারের মারমুখী ভঙ্গি দেখে পিছিয়ে এল ওরা।

হিরু বলল, দেখলে তো কেমন পাজি লোক।

বুম্বার মুখটা থমথম করছে রাগে। বোঝাই যাচ্ছে, ভালোমতো প্রেসটিজে লেগেছে। একটা ঢিল কুড়িয়ে নিল বুম্বা। ছুড়তে যাবে, ঠিক তখনই হিরু বাধা দিল তাকে—দাঁড়াও।

বুম্বা বলল, কী হল!

হিরু বলল, ছুড়ো না।

কিন্তু কিছু তো একটা করতে হবে। বুম্বা বলল, এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া যায় না লোকটাকে!

অন্য একটা মতলব এসেছে মাথায়।

কী মতলব?

কিছু বলল না হিরু। শুধু একটু হাসল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল গাড়িটার দিকে। গাড়িটার পিছনে পৌঁছে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর ঘসটে ঘসটে ঢুকে গেল গাড়ির তলায়।

ভয়ানক অবাক হয়ে গেছে বুম্বা। কী করতে চাইছে হিরু মাথায় ঢুকছে না তার। আবার ভয়ও লাগছে একটু। এখন হঠাৎ যদি গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে চলতে শুরু করে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে যাবে তাহলে। নিশ্বাস চেপে বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল সে

গাড়িটার দিকে।

বিপদ-আপদ কিছু ঘটল না অবশ্য। একটু পরেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে হল হিরু। হাতে একটা খোলা সেফটিপিন। সেফটিপিনটা জামায় আটকাতে আটকাতে বলল, চল একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াই। দূর থেকে মজা দেখব।

হিরুর কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা হইহুল্লা শোনা গেল হঠাৎ। সঙ্গে 'ডাকাত-ডাকাত' চিৎকার। একটা বোমা ফাটার শব্দ হল। চমকে উঠে ওরা দেখল, চারজন লোক দৌড়ে এদিকেই আসছে। একজনের হাতে একটা রিভলভার। আর একজনের হাতে লম্বা ছোরা।

একদল লোক ধাওয়া করে আসছিল ওদের। ফের একটা বোম ফাটল। থমকে গেল লোকগুলো।

চারজন দৌড়ে এসে উঠে পড়ল গাড়িটায়। ড্রাইভার বোধহয় স্টার্ট দিয়ে রেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল গাড়ি।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, গাড়িটা যেন জোরে ছুটতে পারছে না। কেমন কচ্ছপের মতো টলমল করতে করতে যাচ্ছে। যে লোকগুলো থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল তারা আবার হইহই করে ছুটে আসছে। ঘিরে ধরেছে গাড়িটাকে।

৪

দুর্ধর্ষ ডাকাতদল ধরা পড়েছে। ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে এসেছিল। হিরু জানত না, ডাকাতদলের গাড়ি ওটা; ডাকাতদলের গাড়ির

চাকার হাওয়া ফেলে দিয়েছে সে। জানার পর এখন একটু গা ছমছম করছে তার।

পুলিশ এসে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। কোমরে দড়ি বেঁধে জিপে তুলছে ডাকাতগুলোকে।

পোস্টমাস্টার হারাধনবাবু বীরদর্পে এগিয়ে গেলেন দারোগার দিকে। স্যার, আমি তাড়া করে ধরেছি এদের। ইস্কুলের স্পোর্টসে ফার্স্ট হতাম স্যার, আমার সঙ্গে পারবে কেন!

অঙ্ক স্যার নরেনবাবু বুক চিতিয়ে এগিয়ে এলেন ভিড়ের মধ্যে থেকে। বললেন, কেন বাজে কথা বলছেন, একটা বোম ফাটতেই তো ভয়ে দৌড় দিলেন, আমি তো গিয়ে পালের গোদাটাকেই ধরলাম।

পঞ্চানন ঘোষাল জোর প্রতিবাদ করলেন। বললেন, আরে আমি তো আগে ড্রাইভরটাকে টেনে নামালাম স্পিড তোলার আগে; একবার যদি গাড়িতে স্পিড তুলে নিত তাহলে কে কাকে ধরত মশাই!

বুম্বা হিরুকে বলল, তুমি গিয়ে আসল কথাটা বলে দাও না দারোগাবাবুকে। ক্রেডিট তো সবটাই তোমার।

হিরু তাচ্ছিল্যের একটা হাসি হেসে বলল, এই সামান্য ব্যাপার নিজের মুখে কী বলব! মাঝেমধ্যেই তো করি এসব।

দারোগার চাবি

বানরগাছির হাবোল চোরের খুব ইচ্ছে ছিল কষে একখানা আত্মজীবনী লিখবে। তার জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা—কত সেয়ানা লোককে বোকা বানিয়েছে, কত জাঁদরেল দারোগাকে ধোঁকা দিয়েছে—সব লেখাজোখা থাকবে! সবচেয়ে টক্কর লেগেছিল তো গোকুল দারোগার সঙ্গে। কখনও হাবোল জিতেছিল, আবার কখনও বাজিমাত করে ছিল গোকুল। একদিন হল কী, হাবোল গেছে পাশের গ্রাম পশপুরে চুরি করতে। বাড়ির পেছনে কচুবনে ঘাপটি মেরে বসে আছে হাবোল; রাত আর একটু নিশুতি হলেই কাজ সারবে। বাড়িতে সেইদিন জামাই এসেছে; খাওয়াদাওয়া চলছে জোর; শুতেও দেরি হচ্ছে তাই। হাবোল জানলা দিয়ে উঁকি মেরে একেবারে তাজ্জব—আরে, এ যে স্বয়ং গোকুল দারোগা! তারপর জামাইয়ের গল্প শুনে তো আক্কেল গুড়ুম। নিজের বীরত্বের গল্প বলছে গোকুল। সব মিছে গল্প—সব গল্পের শেষে জিতে যাচ্ছে গোকুল; হেরে যাচ্ছে হাবোল।

শুনে এত উত্তেজিত হয়ে গেল হাবোল যে, বেখেয়ালে কচুবন থেকেই চিৎকার করে প্রতিবাদ করে উঠল। ব্যস; সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে 'চোর' 'চোর' রব। লাঠি সড়কি টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়ল লোকজন। কোনও প্রকারে পালিয়ে

বাঁচল গোকুল।

পালাল বটে কিন্তু বেজায় চটে গেল হাবোল। তার নামে মিথ্যে রটনা! এর একটা বিহিত দরকার। কিন্তু সে মুখ্য মানুষ; আর চোর। লোকে তার কথা বিশ্বাস করবে কেন! তাই ঠিক করল বই লিখবে। বইয়ে কিছু লেখা থাকলে সবাই কেমন টক করে বিশ্বাস করে নেয়।

কিন্তু তখন লেখাপড়া শেখার বয়েস গড়িয়ে গেছে তার। ভেবেচিন্তে ছেলে খোকাকে ভরতি করে দিল গ্রামের ইস্কুলে। খোকা ভালো করে লেখাপড়া শিখুক। তখন সে মুখে বলবে আর খোকা লিখে দেবে দারোগা জব্দ করার কাহিনি।

এখন, খোকা তো যাতাযাত শুরু করল ইস্কুলে। কিন্তু বাঘের বাচ্চা তো বাঘাই হবে। খোকা পড়াশোনায় অষ্টরম্ভা হলে কী হবে, চুরিতে বেশ পোক্ত। সহপাঠীর বইখাতা, মাস্টারমশাইয়ের ছাতা—এসব টুকিটাকি জিনিস ঝেপে নেওয়া সেই বয়েসেই কাজ বলে গন্য করত না সে। গোকুল দারোগার ছেলে নকুলও ছিল তার সহপাঠী। একদিন সেই নকুলের গলার সোনার চেন হাতিয়ে নিল খোকা।

তারপর থেকে আর ইস্কুল-মুখো হয়নি সে; পাকাপাকিভাবে চলে এল বাপের লাইনে।

দিনে দিনে নিজেকে ঘষে মেজে আরও তুখোড় করে তুলল খোকা। বেতের মতো পিতপিতে চাবুক চেহারা। বানরের মতো গাছ বাইতে পারে; সাঁতার দেয় মাছের মতো। শীতে কাঁপে না, রোদে ঘামে না, সাপ-খোপ, ভূত-প্রেত মানে না কিছুই।

এদিকে ব্যাপার হল কী, সেই নকুল বড় হয়ে হল দারোগা, আর পোস্টিং পেয়ে এল বানরগাছিতে।

বাপেদের মতো ছেলেয় ছেলেয় জমে উঠল লড়াই।

পরপর তিন রাত তিনটে চুরি করল খোকা। প্রথম রাত নন্দীদের বাগান থেকে দুকাঁদি কাঁঠালি কলা, দ্বিতীয় দিন সামন্তদের বাড়ি থেকে সাইকেল, আর তৃতীয় দিন পাঁচু হালদারের মুদির দোকান থেকে আধবস্তা আলু। তিনদিনই বেমালুম বোকা বনে গেল নকুল দারোগা। বানরগাছিতে কানঘুষো শোনা গেল—এ দারোগা কোনও কম্মের নয়। কথাটা কানেও এল নকুলের।

চতুর্থদিন ফাঁদে পড়ে গেল খোকা। কানাই অধিকারীর গোডাউন থেকে চালের একটা বস্তা মাথায় নিয়ে সবেমাত্র রাস্তায় পা দিয়েছে, দেখে কিনা সামনেই নকুল দারোগা। সঙ্গে সঙ্গে উলটো বাগে দিল দৌড়। সত্যি, ট্রেনিং বটে খোকার। অমন ভারী বস্তা মাথায় নিয়ে কী জোরেই না দৌড়াচ্ছে আর ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে নকুল।

নকুল দেখল কিছুক্ষণের মধ্যেই নাগালের বাইরে চলে যাবে খোকা। সে তখন রিভলভার থেকে বস্তা লক্ষ করে গুলি ছুঁড়ল একটা; ফুটো হয়ে গেল চালের বস্তা।

এদিকে বিস্তর আগান বাগান ভেঙে, খানা ডোবা টপকে পালিয়াড়ার জঙ্গলে পোড়ো বাড়িটায় হাজির হল খোকা। খুব নিশ্চিন্ত সে। নকুলের বাপ-ঠাকুরদার সাধ্যি নেই এখানে খুঁজে পাবে তাকে।

কিন্তু বস্তার ফুটো থেকে ঝুরো ঝুরো চাল পড়েছিল রাস্তায়। সেই নিশানা দেখে একটু পরেই হাজির হল নকুল দারোগা। একেবারে বমাল ধরা পড়ে গেল খোকা।

নকুল দারোগা তার কোমরে দড়ি বেঁধে বুক ফুলিয়ে থানায় নিয়ে এল। ভাবখানা এই—আমার সঙ্গে চালাকি! এখন দেখ মজা!

নকুল পুরুষানুক্রমে দারোগা। আর পাঁচটা দারোগার চেয়ে তার শাস্তি দেওয়ার ধরন আলাদা রকম। মার ধোরের দিকে যায় না সে; ওটা তো সবাই পারে। প্রথম দিন করল কী, তার কালো কচুকুচে কুকুরটাকে গারদের ভেতর দিল ঢুকিয়ে। কুকুরটার নাম জঙ্গি হলেও ভারি নিরীহ কুকুর, কামড়া-কামড়ির অভ্যেস নেই। কিন্তু গা ভরতি থিকথিকে পোকা। নকুল হুকুম জারি করল একশোটা বাছলে দুপুরের খাবার মিলবে।

কাচের একখানা শিশি দিয়ে গেল একজন সেপাই। জ্যান্ত পোকা বেছে ঢোকাতে হবে তার মধ্যে। জঙ্গি দিব্যি ঠ্যাং ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল গারদের মেঝেয়। সেপাইটা দাঁড়িয়ে রইল পাশে; পোকা গুনে নেবে।

পোকা বাছতে শুরু করে খোকা বুঝতে পারল ধকলের কাজ। পোকাগুলো মহা ধুরন্ধর; তাদের পাকড়াও করা বেশ কঠিন। এলোম-ওলোমের ফাঁক গলে বেরিয়ে যায়; কখনও আত্মগোপন করে জঙ্গির কানের মধ্যে। জঙ্গির এমনিতে সব ভালো; কিন্তু

আত্মসম্মানবোধ প্রবল; কিছুতেই কানে হাত দিতে দেবে না। কানে হাত পড়লেই তিড়িং বিড়িং লাফায়।

সারাদিন ধরে খোকার সঙ্গে পোকাদের কঠিন চোর-পুলিশ খেলা চলল। দিনের শেষে একশোটা ধরা পড়ল খোকার হাতে। ভারি আরাম বোধ করল জঙ্গি; কৃতজ্ঞতায় চেটে দিল খোকার হাত।

পরদিন আবার নতুন উৎপাত। দুপুরবেলা সেপাইটা দারোগা গিন্নির পোষা বেড়াল নিয়ে হাজির। রোজ দুপুরে সে নাকি বড় বজ্জাতি করে। দারোগা গিন্নি ঘুমলে চুপিচুপি বেরিয়ে পাড়ায় টো টো ঘোরে; এর তার হেঁশেলে ঢুকে হাঁড়ি খায়। দারোগার হুকুম, দুপুরে ঘুম পাড়াতে হবে একে। একটু গা চুলকে দিলেই নাকি সে ঘুমিয়ে পড়বে। সারা দুপুর বসে বসে বেড়ালের গা চুলকে দিল খোকা। বেড়ালটা আবার ভারি ত্যাঁদড়। সেও মাঝে মাঝে খোকার গা চুলকে দেওয়ার চেষ্টা করল।

দুদিন কুকুর-বেড়ালের সেবা করে খোকা বেজায় কাহিল। টনটন করছে ঘাড়; আঙুলে ব্যথা। ক্ষোভে অভিমানে চোখে জল এসে যাচ্ছে। হাজার হোক, এক সময় বন্ধু ছিল তারা। কতদিন এক বেঞ্চে পাশাপাশি বসেছে। খোকা একবার পাড়ুইদের বাগান থেকে কালোজাম পেড়ে খাইয়েছিল নকুলকে; আর একবার আম আঁটির ভেঁপু বানিয়ে দিয়েছিল। সে সব ভুলে গেল! এভাবে হয়রানি করল তাকে! এর চেয়ে দু-ঘা মার দিলে কিছু মনে

করত না খোকা।

সেদিন রাতেই বেমালুম একটা সুযোগ এসে গেল। খোকা দেখল লকআপের তালা খোলা। সেপাইটা বোধহয় লাগাতে ভুলে গেছে। খুব সন্তর্পনে পা টিপেটিপে বাইরে এল খোকা। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মনে হল নকুলকে একটু শায়েস্তা করা দরকার; বাগে পেয়ে বড্ড নাজেহাল করেছে। বাবা শিখিয়েছিল, দারোগা টিট করার সবচেয়ে ভালো উপায় তার বাড়িতেই চুরি করা। ব্যাপারটা জানাজানি হলে লজ্জায় মাথা কাটা যায় দারোগার; লোক সমাজে মুখ দেখাবার জো থাকে না।

থানার পেছনেই দারোগার কোয়ার্টার। চুপিচুপি এগোল খোকা। জানলা দিয়ে উঁকি দিল ঘরের মধ্যে। অঘোরে ঘুমচ্ছে নকুল আর গিন্নি। বেড়ালটা শুয়ে আছে পায়ের কাছে। খোকা মনে মনে বলল, নাও ভাই, শেষ বারের মতো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নাও। মালপত্তরের সঙ্গে তোমার ঘুমটাও আজ নিয়ে যাব। কাল থেকেই রাতের ঘুম ছুটে যাবে।

কোয়ার্টারের পাঁচিল টপকালো খোকা। বারান্দার এক কোণে জঙ্গি ঘুমাচ্ছিল; দৌড়ে এল। আবছা অন্ধকারে ঠিক চিনতে পেরেছে খোকাকে। খোকার কাছে ভারি কৃতজ্ঞ সে। ফলে হাঁকডাক করল না একদম। ল্যাজ নেড়ে খোকার হাত নেড়ে দিল একটু। যেন বলতে চাইল, বড্ড উপকার করেছ ভাই; পোকাগুলো খুব জ্বালাছিল; কতদিন পর শান্তিতে ঘুমলুম। এখন তোমার কী কাজে লাগতে পারি বলো।

মাথা চাবড়ে জঙ্গিকে একটু আদর করে দিল খোকা। বলল,

যা, চুপচাপ জায়গায় শুয়ে পড়।

খুব বাধ্য ছেলের মতো ফের শুয়ে পড়ল জঙ্গি।

ঘরের দরজা পরখ করতে গিয়ে চমকে উঠল খোকা। খিল দেয়নি নকুল। বটে, খুব ডাঁট! মনে মনে ভাবল খোকা, ভেবেছে খোকা চোর যখন গারদে, তখন আর ভয় কী!

পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল খোকা। সর্তক চোখে নজর করল চারপাশ। আজ কার মুখ দেখে উঠেছে কে জানে! কর্তা-গিন্নি দুজনেই ঘুমিয়ে কাদার তাল। বেড়ালটা 'মিউ' করে মৃদু একটা ডাক ছেড়ে ফের ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘরের এক কোণে আলমারি। আলমারিতে চাবি দেওয়া। ঘরে যখন ঢুকে পড়েছে চাবি খুঁজে পেতে আর কতক্ষণ। খোকার কাছে এসব জলভাত। চশমার খাপ, মশলার কৌটো, নস্যির ডিবে থেকে শুরু করে চালের বস্তা, মুড়ির টিন, ঘুঁটের ঝোড়া—কোথা না কোথা থেকে তার চাবি বের করার অভিজ্ঞতা আছে! আজ তবু একটু ঝক্কি গেল। দারোগার বুদ্ধি তো; আর পাঁচ জনের চেয়ে আলাদা। বেশ ঘোরপ্যাঁচের জায়গায় রেখেছে চাবিটা। তবে, এসব কঠিন কাজে আনন্দই আলাদা। মনের জোর বাড়ে; মনে হয়, হ্যাঁ বাপের শেখানো বিদ্যেটা ঠিকমতো হজম করতে পেরেছে।

চাবি পেয়ে গেলে মাল হাপিস করতে আর কতক্ষণ। আলমারি খুলে দারোগা গিন্নির গয়নার বাক্সটা বের করল খোকা। অমনি পেছনে পিলে-চমকানো চিৎকার—অ্যাই ব্যাটা, কী করছিস?

হাত থেকে বাক্সটা ঝনাৎ করে পড়ে গেল মেঝেয়। খোকা পেছন ফিরে দেখে, নকুল দারোগা।

নকুল চটপট জ্বেলে দিল ঘরের আলো। গিন্নিও উঠে বসেছে; তার মুখে মৃদু হাসি।

নকুল বলল, ভেবেছিলি আমার ঘরে চুরি করে আমার নাম ডোবাবি! অত সহজ না কি রে ব্যাটা?

সহজ যে নয় সেটা তো দেখতেই পাচ্ছে খোকা। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে নকুলের দিকে।

নকুল বলে, ওরে বুদ্ধু গারদের তালাটা আমি ইচ্ছে করেই খোলা রেখেছিলুম; বুঝতে পারিসনি?

খোকার মাথায় কিছু ঢুকছে না। ভাবে; স্বপ্ন-টপ্ন দেখছে না তো! ইচ্ছে করে গারদের তালা খোলা রেখেছিল নকুল! এমন মস্করার অর্থ কী! নাকি ব্যাটার মাথায় কঠিন কোনও ব্যামো-ট্যামো হয়েছে।

খোকার ব্যোমভোলা দশা দেখে হাসল নকুল। বলল, ব্যাপার কী হয়েছে জানিস, গিন্নি আমার খুব ভুলো; আলমারির চাবিটা কোথায় রেখেছে কিছুতেই মনে করতে পারছিল না। আমিও অনেক খুঁজেছি; কিন্তু পাইনি। জানতুম, পারলে তুই পারিস জিনিসটা খুঁজে বের করতে। ছোটবেলা থেকে তোকে চিনি তো; তোর ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। তাই টোপটা দিয়েছিলুম তোকে; মটকা মেরে পড়েছিলুম বিছানায়।

খোকা বোঝে এ যাত্রায় বন্ধু টেক্কা দিয়েছে তাকে। কিন্তু কিছু করার নেই। বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। থানার সামনে

একটা গরু বাঁধা থাকে দেখেছে খোকা; শুনেছে, একজন সেপাইয়ের নাকি একটা পোষা বাঁদর আছে। এদের মধ্যে কাকে ঘুম পাড়াতে হবে, আর কার পোকা বাছতে হবে কে জানে?

নকুল গিন্নিকে বলল, একটু চা চাপাও দেখি। খোকা আমার ছেলেবেলার বন্ধু, তার ওপর এতবড় একটা উপকার করল; এক কাপ চা ওর পাওনা হয়।

বেড়ালটা ঘুম ভেঙে যেতে মনে হয় খুব বিরক্ত। মিউ করে ডেকে একটু প্রতিবাদ করল। যেন বলতে চাইল, শান্তিতে যে একটু ঘুমব, তোমাদের জ্বালায় হবে না দেখছি।

হাসির গল্প লা-জবাব! বাংলার হাসির গল্পের এক বিরাট ধারাবাহিকতাও রয়েছে। তার নবতম সংযোজন উল্লাস মল্লিক।

নাম যেমন, লেখাও তেমন। উল্লসিত না হয়ে থাকা ভারি মুশকিল।

উল্লাস মল্লিক-এর তেমনই একডজন বেমক্কা মজার গল্প নিয়ে এই বই।

গল্পগুলির শুরু 'চপের ভেতর ভূত', আছে 'ভল্লুকনাচ', 'সাধনবাবুর সম্পদ', 'দামু দারোগার দাওয়াই',...শেষ গল্প 'দারোগার চাবি'।

বই তো নয়, যেন হাসির হাওয়া!

জন্ম হাওড়া জেলার গ্রামের এক শিক্ষক পরিবারে, ১৯৭১ সালে। মাধ্যমিক পাশের পর এলোমেলো জীবন। অবশেষে স্নাতক। তারপর আবার উদ্দেশ্যহীনতা। প্রভূত অভিজ্ঞতা। শিক্ষকতা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম থেকে বিহারে মফস্‌সলের স্কুলে। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন এবং ভিন্ন পথের সন্ধান।

২০০০ সাল থেকে সাহিত্যচর্চার শুরু। প্রথম প্রকাশিত গল্প 'চপের ভেতর ভূত' রবিবাসরীয় আনন্দমেলায়, ২০০০ সালে। প্রথম উপন্যাস পূজাবার্ষিকী আনন্দলোকে, ১৪১৩ সালে। 'দেশ' হাসির গল্প প্রতিযোগিতায় ২০০৪ এবং ২০০৫ সালে বিজেতা এবং ২০০৭ সালে প্রশংসিত। প্রথম পত্র ভারতী থেকে প্রকাশিত বই 'এসো আমার সঙ্গে'।

ভালোবাসেন ক্রিকেট এবং শস্যশ্যামল খেত। অবসরে বেরিয়ে পড়েন কোনও নতুন রাস্তা ধরে অচেনা দিকে।

প্রচ্ছদ **সুদীপ্ত মণ্ডল**

বই তো নয়, যেন হাসির হাওয়া!
নাম যেমন, লেখাও তেমন।
উল্লসিত না হয়ে থাকা
ভারি মুশকিল।
তেমনই একডজন বেমক্কা
মজার গল্প নিয়ে

হাসি মজা ঠাসাঠাসি

INR 120.00
9 788183 741705
www.bookspatrabharati.com